উপন্যাস সিরিজ

{মহীরুহ}

প্রবীর হালদার

মহীরুহ

প্রবীর হালদার

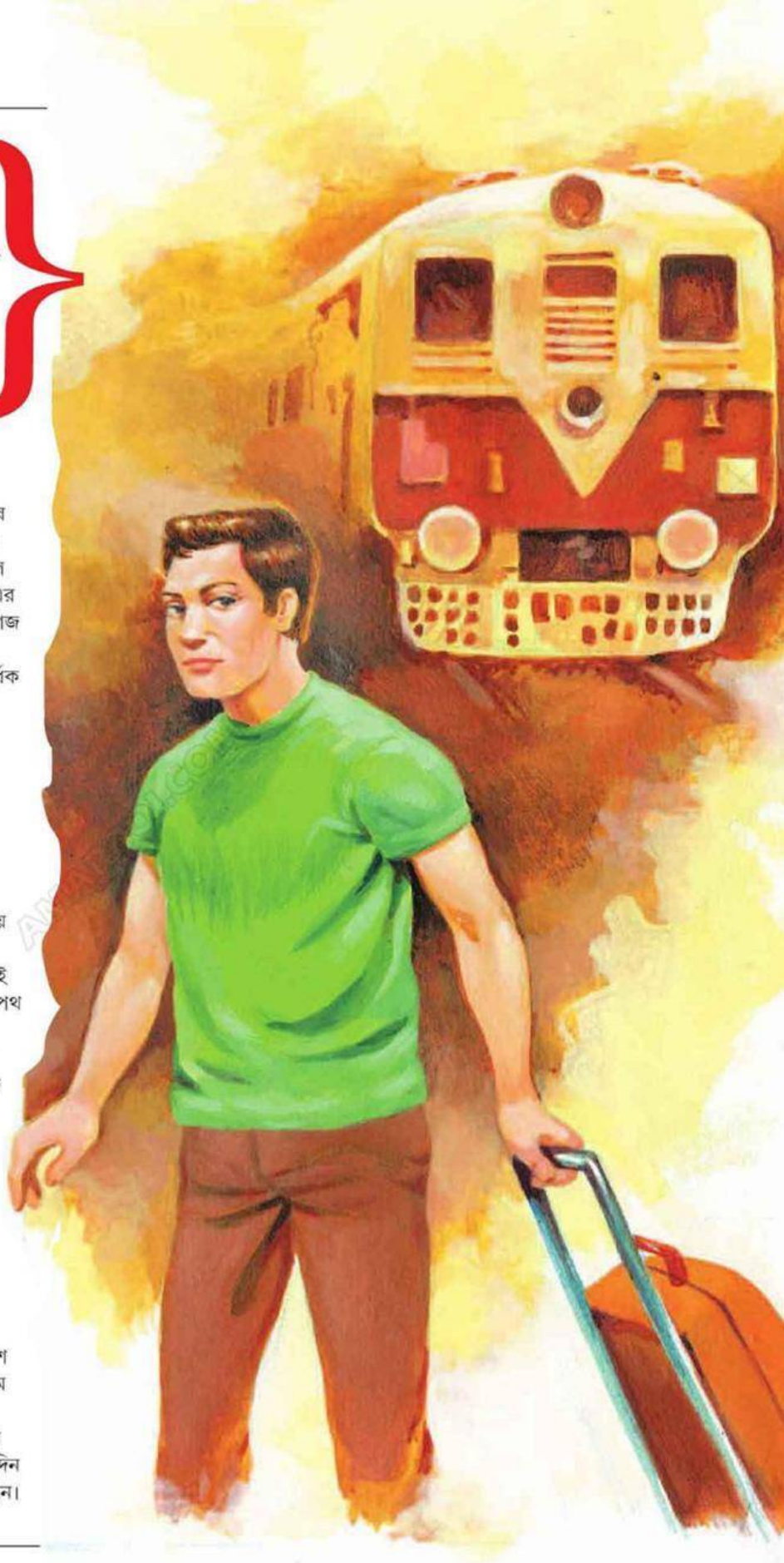

মছলন্দপুর স্টেশনে বনগাঁ লোকাল থামতেই প্রত্যুষ প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে নিজের ট্রলিব্যাগ সামলে নেমে পড়ল। আজ রবিবার। ছুটির দিন। কিন্তু বনগাঁ লোকালে ভিড়ের কোনও কমতি নেই। ভিড় বলে ভিড়! প্রত্যুষ এর আগে বনগাঁ লোকালের ভিড়ের গল্পই শুধু শুনেছে। আজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল। ভিড়ে একেবারে চিঁড়েচ্যাপ্টা হওয়ার জোগাড়! তবু ভাগ্য ভাল বলতে হবে যে, অর্ধেক পথ পেরনোর পর বারাসাত জংশনে বসার জায়গা পেয়েছিল। ইচ্ছে ছিল শিয়ালদহ পৌঁছে গোবরডাঙা লোকাল ধরার। কিন্তু বরানগর স্টেশন থেকে ডাউন ডানকুনি লোকাল ধরে শিয়ালদহ পৌঁছতেই কুড়ি মিনিটের পথ এক ঘণ্টা লেগে গেল সিগন্যালের গন্ডগোলে! ফলে পরবর্তী বনগাঁ লোকাল পেতে ঠায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট শিয়ালদহ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু শিয়ালদহ থেকেও প্রত্যুষ বনগাঁ লোকালে বসার জায়গা পায়নি। অতবড় ট্রলিব্যাগ নিয়ে রানিং ট্রেনে ওঠার অভিজ্ঞতা না থাকলে যা হয়। তার উপর বনগাঁ লোকাল। কামরার মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতেই দ্যাখে সব সিট ভর্তি হয়ে গিয়েছে। প্রথমে তো এতটা পথ দাঁড়িয়ে যেতে হবে ভেবে প্রত্যুষের খারাপ লাগছিল। উপরন্তু একনাগাড়ে ঠেলাঠেলি, চিৎকার এবং ঝগড়া। একেবারে হই-হট্টগোলের জগাখিচুড়ি! এভাবে লোকে যেতে পারে! প্রত্যুষের বেশ অবাক লাগছিল একথা ভেবে যে, এই লাইনে নিত্যযাত্রীরা বছরের পর বছর কীভাবে এত কষ্ট সহ্য করে যাতায়াত করে! প্রত্যুষ বাবার মুখে একজন সহকর্মীর কথা প্রায়ই শুনত। ভদ্রলোক আবার হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট। প্রায়দিনই বনগাঁ লোকালের অনিয়মিত ট্রেন চলাচলের জেরে অফিস পৌঁছতে দেরি হয়ে যেত তাঁর। ভদ্রলোক আসতেন চাঁদপাড়া থেকে। বেজায় রসিক। তাঁর কথায় বনগাঁ লোকালের ভিড় নাকি 'বস্তায় ঠাসা কুঁড়ো'র মতো, হাওয়া চলাচলের জায়গাও থাকে না। কথাটা আজ বেশ ভাল করেই টের পেয়েছে প্রত্যুষ। হকারের দাপটও কম নয়। মাথায় বড়-বড় ফলের ঝুড়ি কিংবা ব্যাগবোঝাই জিনিসপত্র নিয়ে যেভাবে ভিড় ঠেলে তারস্বরে চিৎকার করতে-করতে তারা হকারি করে, ভাবা যায় না! সারাদিন ধরে এমন অমানুষিক শক্তি ওরা পায় কীভাবে কে জানে। আশ্চর্যজনক বটে! এরই নাম জীবনসংগ্রাম।

অবশ্য সেও আজ জীবনসংগ্রামের নতুন পথিক। জীবনে প্রথম চাকরির নিয়োগপত্র নিয়ে চলেছে প্রত্যন্ত গ্রাম লক্ষ্মীপুরে। বাড়ির সবাই প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিল। প্রত্যুষের বাবা প্রমথনাথ চেয়েছিলেন, তাঁর একমাত্র সন্তান যেন এখনই একটা যেমন-তেমন চাকরির পিছনে না ছুটে দেশের সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক পরীক্ষা আইএএস-এ সফল হয়ে তাঁর চেয়েও বড় অফিসার হয়। প্রত্যুষের বাবাও অবশ্য একজন বড় অফিসার। ডব্লিউবিসিএস। বর্তমান রাজ্য সরকারের যুগ্মসচিব।

প্রত্যুষ কিন্তু বেছে নিল বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি। তাও আবার ফিজিক্যাল এডুকেশনের শিক্ষক। বাবার অমতেই প্রত্যুষ শারীরশিক্ষার বিশেষ পাঠ্যক্রম শেষ করে উজ্জ্বল রেজাল্টসহ শিক্ষকতার চাকরির পরীক্ষায় বসতে পেরেছিল। প্রত্যুষের ছোটবেলা থেকে খেলাধুলোর প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। স্বপ্ন ছিল বিরাট ফুটবলার হওয়ার। তার ছ'ফুট উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে স্কুল-কলেজে সে দাপটের সঙ্গে ফুটবল খেলত। পজিশন ছিল ফরোয়ার্ডে। তার অসাধারণ দক্ষতাতেই তার কলেজ পরপর দু'বার আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। শুধু ফুটবলেই সে দক্ষ ছিল না, কলেজের সেরা অ্যাথলিটও ছিল। ছোটবেলায় নিয়মিত যোগব্যায়াম করত। যেখানে যোগব্যায়ামের প্রতিযোগিতা হত, সেখান থেকেই প্রাইজ় নিয়ে আসত। আর ছিল সাঁতারের নেশা। রোজ অশোকগড় থেকে দক্ষিণেশ্বর যেত গঙ্গায় সাঁতার কাটতে। অশোকগড় থেকে দক্ষিণেশ্বর সাইকেলে ছ'-সাত মিনিটের পথ। সঙ্গে থাকত ইউবি কলোনি আর বেলঘরিয়া পুলিশ কোয়ার্টারের কয়েকজন বন্ধু। ওদের সাইকেলগুলো থাকত পঞ্চবটী তলায় নির্দিষ্ট একটা জায়গায়। প্রাণভরে গঙ্গায় সাঁতার কাটত ও। সাঁতারেও প্রত্যুষ প্রচুর পুরস্কার পেয়েছে। ওর বহুমুখী প্রতিভা দেখে ছোটকাকা বলেছিলেন, "এভাবে তোর দক্ষতা চারিদিকে না ছড়িয়ে যে-কোনও একটা খেলায় স্পেশ্যালিস্ট হওয়ার চেষ্টা কর। তাতে সেই ক্ষেত্রে অনেকদূর পর্যন্ত যেতে পারবি।"

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে প্রত্যুষকে শেষপর্যন্ত সক্রিয় খেলাধুলো থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। ডাক্তারের নির্দেশে পরিশ্রম ও টেনশনসাপেক্ষ খেলাধুলো করা এখন বারণ। হার্টের একটা ছোট্ট অপারেশন তার সব স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়েছে। ভবিষ্যতে আর কোনওদিনই সে বড় খেলোয়াড় হতে পারবে না। তবু খেলাধুলো আর মাঠ তার হৃদয়ের সব জায়গা জুড়ে আছে। শারীরশিক্ষার শিক্ষকের নিয়োগপত্র পেয়ে প্রত্যুষ প্রথমে আবেগবিহ্বল হয়ে গেলেও বাড়ির সবার অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারে বেশ চিন্তিত ছিল। মায়ের ইচ্ছে ছিল, প্রত্যুষ যেন অন্ততপক্ষে এমএ-টা পাশ করে তবে চাকরি করে। আর বাবার তো বরাবরের ইচ্ছে, সে যেন ডব্লুবিসিএস বা আইএএস অফিসার হয়।

প্রত্যুষের ছোটকাকা হাইকোর্টের উকিল। প্রত্যুষের চাকরি পাওয়ার পর খবর পেয়ে বলেছিলেন, "মাস্টার হোস, ক্ষতি নেই। কিন্তু শেষপর্যন্ত শারীরশিক্ষার মাস্টার হতে গেলি? ও তো মেঠোমাস্টার। মাঠে-ঘাটেই মাস্টারি করতে হবে ছেলেপুলে নিয়ে।"

প্রত্যুষ হেসে বলেছিল, "হ্যাঁ ছোটকা, আমি মেঠোমাস্টারই হতে চাই। মাঠ আমায় ছোটবেলা থেকে টানে। খেলোয়াড় হয়ে মাঠ দাপানোর সুযোগ তো আর পেলাম না! তবে শারীরশিক্ষার মাস্টার হয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে তো মেটাতে পারব। সবচেয়ে বড় কথা, ছোটদের নিজের মতো করে গড়ে তুলতে পারব। কারণ মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তোলাও শারীরশিক্ষার উদ্দেশ্য। এই শিক্ষাই আমি গ্রামের বাচ্চাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই।"

খুশি হয়ে ছোটকাকা বলেছিলেন, "কিন্তু গ্রামগঞ্জে ক্রমশ স্কুলছুট ছেলেমেয়েদের সংখ্যা যে বেড়েই চলেছে, সেটা রোধ করতে পারবি?"

প্রত্যুষ বলেছিল, "জানি না এ ব্যাপারে কতটা সফল হতে পারব। তবে চেষ্টার কোনও কসুর করব না। জানি যে স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ফেরানোর লড়াইটা বেশ কঠিন, তবে আমি আমার তরফ থেকে লড়াই চালিয়ে যাব।"

প্রত্যুষের ছোটকাকা শেষপর্যন্ত তাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "তোর উদ্দেশ্য সফল হোক। একটা বাচ্চা ছেলেকেও যদি মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে পারিস, তা হলেই ভাববি তোর ভাবনাচিন্তা সার্থক। তবে সবার আগে দরকার নিজেকে একজন ভাল মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা। তা হলেই দেখবি তোর টানে মানুষ তোর কাছে ছুটে আসবে।"

প্রত্যুষ কাকার কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে স্টেশন চত্বর ছেড়ে বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, তিনআমতলায় একটা বাস-দুর্ঘটনার জন্য সকাল থেকে বাস সার্ভিস বন্ধ। এদিকে খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। সামনেই মছলন্দপুরের বিখ্যাত মিষ্টির দোকান। প্রত্যুষ কোণের দিকে একটা খালি চেয়ার দেখে বসে পড়ল। প্রথমে দুটো শিঙাড়ার অর্ডার দিল। চাটনি দিয়ে শিঙাড়া খেতে-খেতে তার মন ভরে গেল। প্রত্যুষ এবার একটা ছানার জিলিপি আর রসমালাইয়ের অর্ডার দিল। মিষ্টিগুলোও দারুণ। মুখোমুখি বসা একজন প্রৌঢ় বললেন, "এ তল্লাটে নতুন বুঝি?"

প্রত্যুষ বলল, "হ্যাঁ। দোকানটার মিষ্টি আর শিঙাড়া খুব সুস্বাদু।"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক হেসে বললেন, "এই দোকানটার খুব সুখ্যাতি। এই দোকানের মিষ্টি বাংলাদেশেও যায়।"

প্রত্যুষ বলল, "তাই বুঝি! আচ্ছা এখান থেকে বর্ডার কি খুব কাছে?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বললেন, "মছলন্দপুর থেকে অনেকভাবে বর্ডারে যাওয়া যায়। সবচেয়ে কাছের বর্ডারে যেতে হলে ঠাকুরনগর স্টেশনে নেমে অটোতে মাত্র উনিশ-কুড়ি মিনিট গেলেই বর্ডার দেখা যাবে।"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখে এসব কথা শুনে প্রত্যুষের মনে বহুদিনের পুরনো ইচ্ছেটা আবার জেগে উঠল। কোনওদিন সে বর্ডার বর্ডার অঞ্চলের এত কাছে যখন সে শিক্ষকতা করতে এসেছে, একদিন ঠিক সুযোগমতো বর্ডার দেখতে যাবে।

যশোহর মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে বেরিয়ে প্রত্যুষ একটা ভ্যানরিকশায় উঠল। সে বেছে-বেছেই লক্ষ্মীপুরগামী ওই ভ্যানরিকশায় উঠেছে কারণ ভ্যানরিকশা-স্ট্যান্ডে যেক'টা ভ্যানরিকশা দাঁড়িয়েছিল, তার মধ্যে ওই ভ্যানরিকশার চালকই বয়সে সবচেয়ে ছোট। নিশ্চয়ই স্কুলছুট। কত আর বয়স হবে! তেরো কি চোদ্দো! ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করার জন্যই প্রত্যুষ তার ভ্যানরিকশায় চেপেছে।

আমি মেঠোমাস্টারই হতে চাই। মাঠ আমায় ছোটবেলা থেকে টানে। খেলোয়াড় হয়ে মাঠ দাপানোর সুযোগ তো আর পেলাম না! তবে শারীরশিক্ষার মাস্টার হয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে তো মেটাতে পারব।

প্রত্যুষের সঙ্গে আরও একজন বৃদ্ধ ছেলেটার ভ্যানরিকশায় সওয়ারি হয়ে উঠে বসলেন। স্টেশন-সংলগ্ন ভ্যানরিকশা স্ট্যান্ড ছাড়াতেই কিশোর ছেলেটা তীব্রগতিতে চালাতে শুরু করল।

বৃদ্ধ লোকটি বলে উঠলেন, "এই ভাই! অত জোরে চালিয়ো না। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে।" কিন্তু প্রত্যুষ ছেলেটার ভ্যানরিকশা চালানোর গতি দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। এই বাচ্চা ছেলেটা এত জোরে

ভ্যানরিকশা চালাতে পারে! আশ্চর্য! তা হলে কত জোরে দৌড়তে পারে? এর তো রানার হওয়ার কথা ছিল।
প্রত্যুষ ছেলেটাকে বলল, "এই, তোর নাম কী রে?"
ভ্যানরিকশা চালাতে-চালাতে ছেলেটা বলল, "মন্টু।"
"মন্টু কী?"
"মন্টু মণ্ডল।"
প্রত্যুষ এবার জিজ্ঞেস করল, "থাকিস কোথায়?"
"আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই।"
"আমি তো লক্ষ্মীপুর স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলে যাব।"
"আমাদের বাড়ি ওই স্কুলের পাশেই।"
"তুই কি এখনও স্কুলে পড়িস?"
হঠাৎ মন্টুর ভ্যানরিকশার চেনটা পড়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ কসরত করে চেনটা ঠিকমতো লাগিয়ে আবার চালকের সিটে উঠে পড়ল মন্টু।
একটুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ফের প্রত্যুষ মন্টুকে বলল, "কই বললি না তো, তুই কি এখনও স্কুলে পড়িস, নাকি ছেড়ে দিয়েছিস?"
মন্টু এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "আর লেখাপড়া করে কী লাভ?"
তার মানে! বিস্মিত প্রত্যুষ পরক্ষণেই বলল, "লেখাপড়াটা ছাড়ার কারণটা কী, বলবি?"
মন্টু ঝটিতি জবাব দিল, "কিন্তু আমার লেখাপড়া ছাড়ার কারণ জেনে আপনার লাভ কী কাকু?"
"আমি একজন শিক্ষক হিসেবে লক্ষ্মীপুর স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলে যোগ দিতে যাচ্ছি। সেইজন্যেই জানতে চাইছি তুই লেখাপড়া ছাড়লি কেন? আচ্ছা তার আগে বল, কতদূর লেখাপড়া করেছিস?"
"ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছি। গত বছরই ছেড়ে দিয়েছি। আমি স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলেই পড়তাম।"
"কিন্তু ছাড়লি কেন?"
"আমি ভ্যান না চালালে আমাদের সংসার চলবে কেমন করে? বাবা বিছানায় পড়ে আছে আজ আট মাস হল।"
"কেন?"
"পঞ্চায়েত ভোটের সময় বোমাবাজির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল বাবা। ডান পায়ে বোমার দুটো টুকরো ঢুকে হাড় ভেঙে একাকার। অপারেশনের পরেও ভাল হয়নি আর। এখন কোনওমতে দাঁড়াতে পারে। বাবার রিকশাভ্যানটা তাই এখন আমিই চালাই।"
"তোদের বাড়িতে আর কে-কে আছে?"
"মা আর বড়দি। মায়ের হাঁপানির রোগ আছে। আগে ধানকলে কুঁড়ো ঝাড়ত। এখন ডাক্তারের নিষেধ আছে। বড়দি ঘরে ঠোঙা বানায়।"
"সত্যি দুঃখজনক ঘটনা," প্রত্যুষ বিষণ্ণ স্বরে কথাটা বলল।
রিকশাভ্যানে বসা বৃদ্ধ লোকটি এবার প্রত্যুষকে বললেন, "আপনি স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলে নতুন শিক্ষক হয়ে এসেছেন বুঝি?"
"হ্যাঁ, আজ তো রবিবার। আগামিকালই জয়েন করব।"
"আপনি কোথা থেকে আসছেন জানতে পারি কি?" বলেই বৃদ্ধ লোকটি নস্যির কৌটো বের করলেন।
"আমি থাকি উত্তর কলকাতায়। বরানগর ডানলপ ব্রিজের কাছে অশোকগড়ে আমাদের বাড়ি।"
"শহর ছেড়ে গ্রামে এসেছেন। এবার বুঝতে পারবেন ঘরে-ঘরে এরকম কতশত দুঃখের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। অভাব, দারিদ্র আর বিচিত্র সব পারিবারিক সমস্যার জন্যেই আজ আমাদের গোটা দেশে স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। সরকার আর কতই বা পারবে এর সুরাহা করতে? আচ্ছা আপনি উঠছেন কোথায়?"
প্রত্যুষ এবার ম্রিয়মাণ কণ্ঠস্বরে বলল, "সে কথাই তো ভাবছি। কোথায় যে ওঠা যায়! একেবারে অজানা অচেনা জায়গা। কাউকেই চিনি না, জানি না। এদিকে স্কুলও আজ বন্ধ। রবিবার।"
"যদি কিছু মনে না করেন তো একটা প্রস্তাব দেব?"
"আপনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন," প্রত্যুষ আপন হওয়ার চেষ্টা করল।
"আপনি আমার বাড়িতে থাকতে পারেন। আমার বাড়ি লক্ষ্মীপুরেই। বেড়গুম এক নম্বর পঞ্চায়েত অফিসের পাশেই। ওখান থেকে আপনার স্কুল মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। আমার বাড়িতে থাকতে আশা করি আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। আপনি কি রাজি আছেন? অসম্মতি থাকলেও বলতে পারেন।"
"অসম্মতি! কী যে বলেন! এ তো মেঘ না চাইতেই জল। আমার পরম সৌভাগ্য যে চেষ্টা না করেই এভাবে আপনার বাড়িতে থাকার সুযোগ পাচ্ছি। আচ্ছা আপনার পরিচয়টা যদি একটু বলেন।"
বৃদ্ধটি নাকে নস্যি নিয়ে বললেন, "এই দ্যাখো! আমার পরিচয়টা আগেই দেওয়া উচিত ছিল। আমার নাম মহীতোষ মুখোপাধ্যায়। পেশায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। আর নেশা, কিছু আশ্রয়হীন শিশু, কিশোর-কিশোরীদের মানুষ করা আর গাছ লাগানো। আশ্রয়হীন বাচ্চাগুলো আমার বাড়িতেই থাকে। আমার স্ত্রী ওদের দেখাশোনা করে। আমরা যে নিঃসন্তান, এখন আর তা মনেই হয় না। আপনি আমাদের বাড়িতে থাকলে ওদেরও অনেক উপকার হবে।"
প্রত্যুষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে মহীতোষবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার মতো একজন সমাজসেবীর সান্নিধ্যে থাকা আমার কাছে রীতিমতো গর্বের ব্যাপার। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ যে, আপনার মতো একজন পরোপকারী মানুষের সঙ্গে আমাকে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। তবে আমাকে আপনি এবার থেকে 'তুমি' বলবেন।''
মহীতোষবাবু হেসে বললেন, "ঠিক আছে।"

॥ ২ ॥

বিদেশবিভূঁইয়ে পা রাখতে না রাখতেই যে এমন সুন্দর একটা বাসস্থানে থাকার সুযোগ পাবে, তা কল্পনাও করতে পারেনি প্রত্যুষ। একেবারে ছবির মতো প্রকৃতির মাঝে মহীতোষবাবুর বাড়ি। মহীতোষবাবুর দাদুর আমলের বাড়ি। ছোট্ট নদী যমুনা পুবমুখো হয়ে মিশে গিয়েছে ইছামতী নদীতে। যমুনা নদীর দক্ষিণ দিকে তীরঘেঁষা মনসামণ্ডপের লাগোয়া বাড়িটাই মহীতোষবাবুর। একসময় যমুনা নদীর উত্তর দিকে জমিদারবাড়ির প্রকাণ্ড মেজোতরফ ছিল। এখন শুধু পড়ে আছে বিরাট সিংহদুয়ার। তার পাশে প্রাচীন সূর্যঘড়ি। একটু পাশেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে গোবরডাঙার জমিদারবাড়ির বহু প্রাচীন ঐতিহ্যময় কালীবাড়ি। মেজোতরফ না থাকলেও একটু পশ্চিমে আছে ছোটতরফ। সেটাও বৃহদাকার। তার সামনে দ্বীপমতো জলাভূমি। যমুনা নদীর উত্তর পাড়ে গোবরডাঙা। দক্ষিণপারে লক্ষ্মীপুর আর কুচুলিয়া গ্রাম।
ছাদের উপর দাঁড়িয়ে মহীতোষবাবু প্রত্যুষকে সবকিছু দেখাতে থাকেন। বাঁদিকে যমুনা নদীর উপর বিশাল পাকা সেতু। গোবরডাঙার সঙ্গে এপ্রান্তের লক্ষ্মীপুর আর কুচুলিয়া গ্রামের যোগাযোগ রক্ষাকারী একমাত্র সড়কপথ। গোবরডাঙার বিখ্যাত লেখিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর নামে সেতুটি। ডানদিকে তাকালে চোখে পড়ে রেলব্রিজ। অনতিদূরে গোবরডাঙার কালাচাঁদ কুণ্ডু শ্মশান।
জমিদারবাড়ির ডানদিকে এবং যমুনা নদী তীরবর্তী দুটো মাঠ দেখে প্রত্যুষ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, "এখানে বুঝি খুব খেলাধুলো হয়?"
"এখন হয় না, আগে হত।"
মহীতোষবাবুর কথাটা প্রত্যুষের কেমন যেন হেঁয়ালির মতো মনে হল। তাই বলে উঠল, "কথাটা ঠিক বুঝলাম না।"
মহীতোষবাবু বললেন, "এখানে যতগুলো মাঠ আছে, দশ বছর আগেও সবগুলোয় দাপিয়ে ফুটবল খেলা হত। যমুনা নদীর পারে ওই যে বিশাল মাঠটা দেখছ, তিনটে ফুটবল মাঠের সমান, ওখানে আমরা কী-ই না

খেলেছি! ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, খোখো, হাডুডু, লংজাম্প, হাইজাম্প, ব্যাডমিন্টন... কতকিছু। আর এখন ওখানে শুধু পয়লা বৈশাখে গোষ্ঠবিহারী মেলা বসে। বাদবাকি সময়ে গোরু, ছাগল চরে। বর্ষাকালে তো চড়া পড়া যমুনা নদীর জল উপচে একাকার। খেলার মাঠ তখন একেবারে দিঘি। অন্যসব মাঠগুলোয় এখন শুধু বিশেষ দিনে ক্রিকেট বা ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়। সেসব টুর্নামেন্টে দূর-দূরান্তের ক্লাবগুলো খেলতে আসে। এ অঞ্চলে খেলার পাট একেবারে চুকে গিয়েছে। বিকেল হলেই দেখবে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সেতু দলে-দলে কিশোর-যুবকদের ভিড়ে ছেয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ যুবকদের হাতে মোবাইল আর মুখে সিনেমার গল্প। রাস্তার দুপাশের ফাস্টফুড খাচ্ছে আর মোটা হচ্ছে।"
"আর এখানকার বাচ্চাগুলো? তারা নিশ্চয়ই খেলাধুলো করে?"
"আর খেলাধুলো! ওদের জন্য তো বাড়ি আর ক্লাবের টিভি চ্যানেলগুলো চব্বিশ ঘণ্টা খোলা। আগে বাচ্চাগুলো যমুনা নদীর জলে হুটোপুটি করত, ছিপ দিয়ে মাছ ধরত। কিন্তু এখন তো যমুনা নদী সারাবছর কচুরিপানায় ভর্তি থাকে। পলি জমতে-জমতে মৃতপ্রায়। অথচ কত বড়-বড় নৌকো এই যমুনা নদী দিয়ে যাতায়াত করত। জেলেদের নৌকো চড়ে আমরা কতদিন ইছামতী নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছি। যমুনা নদী এখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরে ইছামতী নদীতে গিয়ে মিশেছে। সেসব গল্প পরে বলব।"

সন্ধে নাগাদ প্রত্যুষকে নিয়ে মহীতোষবাবু স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক মাখনলাল দাসের বাড়ি এলেন। পাশের গ্রাম কুচুলিয়াতে প্রধানশিক্ষকের বাড়ি। মহীতোষবাবুরা যখন প্রধানশিক্ষকের বাড়ি পৌঁছলেন, তখন সেখানে স্কুলের সেক্রেটারি দেবদুলাল চক্রবর্তী প্রধানশিক্ষকের সঙ্গে কথা বলছিলেন।
প্রত্যুষের পরিচয় পেয়ে ওঁরা ভীষণ খুশি হলেন। একথা-সেকথার পর প্রধানশিক্ষক প্রত্যুষকে বললেন, "জানেন তো প্রত্যুষবাবু, সবচেয়ে বেশি চিন্তা, স্কুলছুট ছাত্রদের সংখ্যাটা ক্রমশই বাড়ছে। বাজারদর যে হারে বাড়ছে, একেবারে গরিব ঘরের বাবা-মায়েরা কোন ভরসায় ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবে? সেইজন্যেই শিশুশ্রমিকদের সংখ্যাও লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়ছে। মিড-ডে মিলও কোনও কাজে দিচ্ছে না।"
দেবদুলালবাবু বললেন, "স্কুলের ফিজিক্যাল এডুকেশনের সঙ্গে-সঙ্গে খেলাধুলো বিভাগের সমস্ত দায়িত্বটা যখন নিচ্ছেন, তখন আপনাকেই ভাবতে হবে কীভাবে আবার স্কুলছুট ছাত্রদের স্কুলে ফিরিয়ে আনা যায়। এ ব্যাপারে স্কুলের পরিচালন সমিতি সবসময় আপনাকে সাহায্য করার জন্য তৈরি।"
প্রত্যুষ প্রতিশ্রুতি দিল, তার দায়িত্ব পালনে কোনও ফাঁক থাকবে না।

দোতলায় ছাদের উপর হাঁটতে-হাঁটতে প্রত্যুষের মন ভরে গেল। আজ পূর্ণিমা। আকাশের বুকে ভাসমান চাঁদ থেকে রুপোলি আলোর ঢল নেমেছে। অলৌকিক জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যে ভেসে যাচ্ছে চরাচর।

রাত্রিবেলা খাওয়ার সময় মহীতোষবাবুর স্ত্রী তরুবালা কথাটা পাড়লেন। "আচ্ছা প্রত্যুষ, শহর ছেড়ে এই গ্রাম্য পরিবেশে তোমার আসতে ইচ্ছে হল কেন? লোকেরা তো আজকাল বরং গ্রাম ছেড়ে শহরে যাচ্ছে।"
প্রত্যুষ বলল, "না কাকিমা, বরাবরই গ্রাম আমাকে ভীষণভাবে টানে। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা শহরের তুলনায় অনেক সহজ-সরল। তা ছাড়া শহরের প্রকৃতির চেয়ে গ্রামের প্রকৃতি আমায় অনেক বেশি আকর্ষণ করে। শহরে আজকাল সবকিছুই যেন বড্ড যান্ত্রিক, অথচ গ্রাম এখনও কত প্রাণবন্ত। আজ প্রথম দিনের পরিচয়ে আপনাদের কাছে যে উষ্ণ আতিথেয়তা পেলাম, সেটা শহরে ভাবাই যায় না। "
তরুবালা বললেন, "বাঃ! তুমি তো খুব সুন্দর কথা বল। একেবারে গুছিয়ে। এই না হলে শিক্ষক।"
মহীতোষবাবু বললেন, "তা হলে তুমি স্বীকার করে নিচ্ছ যে, আমাদের গ্রামে সত্যিই একজন ভাল শিক্ষকের আবির্ভাব হল।"
প্রত্যুষ বলল, "ভালমন্দ বিচার তো ভবিষ্যৎ করবে। স্কুলের ছাত্ররা কীভাবে গ্রহণ করল, তার উপরই তো নির্ভর করছে শিক্ষকের ভালমন্দ।"
তরুবালা মৃদু হেসে বললেন, "সত্যিই তুমি গুছিয়ে কথা বলতে পার।"
মহীতোষবাবু বললেন, "তা হলে অন্তত পক্ষে তোমার জন্য গুছিয়ে কথা বলার একজন অতিথি তো জোগাড় করে দিতে পারলাম। এর জন্য তো আমাকে কৃতিত্ব দেবে।"
মহীতোষবাবুর কথায় তিনজন একসঙ্গে হেসে উঠল।

রাতের খাওয়ার পর কিছুক্ষণ হাঁটার অভ্যেস প্রত্যুষের। দোতলায় ছাদের উপর হাঁটতে-হাঁটতে প্রত্যুষের মন ভরে গেল। আজ পূর্ণিমা। আকাশের বুকে ভাসমান চাঁদ থেকে রুপোলি আলোর ঢল নেমেছে। অলৌকিক জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যে ভেসে যাচ্ছে চরাচর। যমুনা নদীর বুকে, জলে, আর কচুরিপানার নীল ফুলে সেই জ্যোৎস্না মাখামাখি হয়ে আরও মনোরম হয়ে উঠেছে। জমিদারবাড়িটাকে মনে হচ্ছে বুঝি এক কল্পনার রাজপ্রাসাদ। ছাদ থেকেই দেখা যাচ্ছে গোবরডাঙার কালাচাঁদ কুণ্ডু শ্মশানঘাটে একটা চিতার আলো জ্বলছে। জ্যোৎস্নার আলো, চিতার আগুনের আলো মিলেমিশে যেন এক কবিতার মুহূর্ত গড়ে তুলছে। প্রত্যুষের হঠাৎ স্কুলছুট ছেলেগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। পারবে কি প্রত্যুষ ওদের জীবনের মূলস্রোতে ফেরাতে? পারতেই হবে প্রত্যুষকে। সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তোলার সংকল্প নিয়েই তো শিক্ষকতা বৃত্তিকে সে বেছে নিয়েছে।
প্রধানশিক্ষক আর সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলার দৃশ্যগুলো প্রত্যুষের আবার মনে পড়ে। সেক্রেটারি দেবদুলালবাবুর কথাটা মনে খুব দাগ কেটেছিল প্রত্যুষের। উনি বলেছিলেন, "আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এখনও বেশ কিছু গলদ আছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা পারেনি আমাদের চেতনাকে শিক্ষিত করে তুলতে, তাই তো আমরা আজ শুধুই কেরিয়ারমুখী। উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের পড়ানোর সময় ওদের শেখাবেন যে, বৃত্তি নয়, হৃদয়বৃত্তিই যেন তাদের আসল পরিচয় হয়।"
গ্যালিলিওর একটা কথাও প্রত্যুষের ভীষণ ভাল লাগে, "তুমি কোনও মানুষকে নতুন কিছু শেখাতে পার না। তুমি শুধু তাকে তার নিজের মধ্যে থেকে তা খুঁজে নিতে সাহায্য করতে পার।"
প্রত্যুষ ছাদ থেকে নেমে নিজের ঘরে শোওয়ার আয়োজন করতেই মোবাইল বেজে ওঠে। এত রাতে আবার কার ফোন? কল রিসিভ করে প্রত্যুষ বলল, "তুমি এখনও ঘুমোওনি মা?"
ওপার থেকে প্রত্যুষের মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "এই প্রথম কাছছাড়া হলি। ঘুম কি এত সহজে আসবে? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? ওখানকার মানুষ কেমন?"
প্রত্যুষ হেসে বলল, "সে ব্যাপারে তুমি কিছু চিন্তা কোরো না মা। লক্ষ্মীপুরে এসেই এমন কিছু ভাল ও জ্ঞানী মানুষের সংস্পর্শে এসে পড়েছি যে, তাতে নিজেকে দারুণ সৌভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে।"

॥ ৩ ॥

স্কুলে যোগদান করার পর প্রথম রবিবারের সকালটা একটু এলোমেলোভাবে উপভোগ করার ইচ্ছে ছিল প্রত্যুষের। সেই ভাবনায় সকাল ন'টায় একা-একাই বেরিয়ে পড়েছিল। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে পরিচয় করার অছিলায় গোবরডাঙা কালীবাড়ির কাছে জগুর চায়ের দোকানের এক কোণে বসে পড়ল। জগুর চায়ের দোকানে সকাল-সন্ধে ভিড় লেগেই থাকে। এলাকার খুব জনপ্রিয় চায়ের দোকান। এখানে কেউ আসে রোজকার চায়ের আসরে আড্ডা জমাতে, কেউ আসে খবরের কাগজ পড়তে, কেউ আসে বাসের অপেক্ষার মাঝে এককাপ চা খেতে। সামনেই গোবরডাঙার কালীবাড়ি বাসস্ট্যান্ড। বাস, অটো, ভ্যানরিকশায় কম লোকজন ওঠে না। যাত্রীদের বেশিরভাগই জগুর দোকানে দু'দণ্ড জিরিয়ে বিখ্যাত চায়ে চুমুক দিয়ে যাবেই। লোকে বলে জগুর হাতে নাকি জাদু আছে।

প্রত্যুষ এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুটের অর্ডার দিয়ে পাশেই বসা একজনের সঙ্গে আলাপ করছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা বাচ্চা ছেলে সমানে এ-টেবিল ও-টেবিল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। হাসিমুখেই চা নিয়ে আসছে কিংবা খাওয়া চায়ের কাপ-প্লেট নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যুষ ওর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। নির্ঘাত স্কুলছুট।

প্রত্যুষের কাছে ছেলেটি যখন চা আর বিস্কুট নিয়ে এল, তখন ও তাকে জিজ্ঞেস করল, "এই তোর নাম কী রে?"

"নিলু," বলেই ছেলেটি ফিক করে হাসল।

প্রত্যুষ ছেলেটার সঙ্গে আলাপ জমাতে গেলে সে বলল, "এখন ভীষণ কাজের চাপ, পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।"

কিছুক্ষণ পরে নিলু আবার এল এঁটো কাপ-প্লেট নিয়ে যেতে। কাপ-প্লেট হাতে একটু এগোতেই হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ল।

মালিকের চেয়ার ছেড়ে স্থূলকায় জগু এগিয়ে এসে সপাটে একটা চড় কষাল নিলুর গালে। রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে বলতে লাগল, "হতচ্ছাড়া! এই নিয়ে এমাসে তিন-তিনবার কাপ-প্লেট ভাঙলি। শালা তোর ফুলের মধু খাওয়া বাপ কি আমার দোকানে ফ্রি-তে কাপ-প্লেট সাপ্লাই দেয়?"

নিলু কাঁদতে-কাঁদতে ঠোঁট ফেটে বেরনো রক্ত মুছতে থাকল।

প্রত্যুষ এগিয়ে এসে জগুকে বলল, "এভাবে কেউ বাচ্চাদের মারে!"

জগু গজগজ করে বলল, "নীতিকথা শোনাতে আসবেন না মশাই। খদ্দের হয়ে এসেছেন, চা-বিস্কুট খেয়েছেন, দাম দিয়ে চলে যান, সিন খতম।"

প্রত্যুষ বলল, "সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনি এভাবে মারছেন কেন?"

জগুর রাগ তবুও কমতে চায় না। বলল, "সে কৈফিয়ত কি আমি আপনাকে দেব? আপনি কি ওর ধর্মবাপ নাকি?"

প্রত্যুষও ছাড়ার পাত্র নয়। সস্নেহে নিলুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "এই, তোর বাড়ি কোথায় রে?"

"আমার বাড়ি নেই।"

"সে কী! তা হলে তোর বাবা-মা কোথায়?"

"জানি না।"

জগু এবার ফুঁসে বলল, "দেখলেন তো? জানবে কী করে? এসব তো বেয়ারিং চিঠি।"

প্রত্যুষ বিস্মিত হয়ে বলল, "মানে!"

"মানে আর কী? বেজন্মা। যার কাছে যাবে, তাকেই এ বোঝা বইতে হবে। এসেছিল একপেট খিদে নিয়ে কাজ চাইতে। দিয়েছি। এখন একটা বাছুরের থেকেও বেশি খায়। তাও তিন বেলা!"

"তাই বলে ওর উপর আপনার হাত তোলার অধিকার জন্মে গেল?"

জগু পিঠ চুলকে বলল, "হাত তুলব না! যে অসুখের যে পুরিয়া। এই নিয়ে একমাসে তিনবার কাপ প্লেট ভাঙল।"

প্রত্যুষ মানিব্যাগ থেকে একটা একশো টাকার নোট জগুর সামনে তুলে ধরতে জগু হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। প্রত্যুষ জগুর ভ্যাবাচ্যাকা মূর্তি দেখে বলল, "আরে ধরুন, নোটটা জাল নয়। এটা তিনটে কাপ প্লেটের ক্ষতিপূরণ। আর আজ থেকে এই বেয়ারিং চিঠির সব দায়িত্ব আমার।"

প্রত্যুষ এবার নিলুর চিবুক তুলে বলল, "কী রে, যাবি তো আমার সঙ্গে?"

নিলু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালে প্রত্যুষ বলল, "আগে তোর ট্রিটমেন্ট হওয়া দরকার।"

নিলুকে নিয়ে প্রত্যুষ কিছুক্ষণের মধ্যে সাহাপাড়ায় সুদীপডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে হাজির হল। সুদীপডাক্তার স্থানীয় গৈপুর শিশু হাসপাতালের বিখ্যাত শিশুচিকিৎসক। নিজের বাড়িতেই হপ্তায় একদিন গরিব শিশুদের ফ্রি-তে চিকিৎসা করেন। আজকেই সেই দিন। তাই বেশ কিছু বস্তির ছেলেদের চোখে পড়ল প্রত্যুষের।

প্রাথমিক কিছু কথাবার্তার পর প্রত্যুষ নিলুর ফাটা ঠোঁটের অংশ দেখিয়ে বলল, "দেখেছেন তো ডাক্তারবাবু, এইটুকু ছেলেকে মেরে কী করেছে!"

সুদীপডাক্তার নিলুর মুখের রক্ত মুছতে-মুছতে বললেন, "একে তো তবু প্রাথমিক চিকিৎসা করলেই সেরে যাবে। কিন্তু ওদের সারাব কী করে বলুন তো!" বলেই বস্তির বাচ্চা ছেলেগুলোকে দেখালেন।

"কেন?" প্রত্যুষ চোখ কোঁচকাল।

"সারাবছর ওদের সর্দি-জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট লেগেই আছে।"

"কেন? ওষুধেও সারে না?"

"সারবে কী করে মশাই! যত স্যাম্পল ফাইল পাই, ওদের জন্য তুলে রাখি। কিন্তু ওষুধ নিয়েই ওরা ফের ছুটবে চোলাই কারখানায় কাজ করতে।"

প্রত্যুষ প্রায় আঁতকে ওঠার ভঙ্গিতে বলল, "বলছেন কী মশাই! চোলাই কারখানায় কাজ করে এইসব বাচ্চাগুলো?"

সুদীপডাক্তার মৃদু হেসে বললেন, "সরকার আইন জারি করেছে চোদ্দো বছরের নীচে কাউকে কাজ করতে দেওয়া হবে না। অথচ ধর্মপুরের চোলাই কারখানায় বেশ কিছু শিশু, কিশোর কাজ করে। ওখানে জলে বিষ, বাতাসেও বিষ।"

প্রত্যুষ বলল, "কেন?"

"ওখানে গেলেই বুঝতে পারবেন। চারিদিকে বিশাল-বিশাল কয়লার উনুনে প্রকাণ্ড সব ড্রামে জাল দেওয়া হচ্ছে চোলাই। কালো ধোঁয়ায় দিনেও দূরের কিছু দেখা যায় না। বাতাসে তীব্র কটু গন্ধ।"

প্রত্যুষ কী ভেবে বলল, "কই এখানে তো কাউকে কোথাও চোলাই নিয়ে যেতে দেখি না।"

সুদীপডাক্তার আবারও মৃদু হেসে বললেন, "আপনি নতুন এখানে এসেছেন, না হলে এ কথা বলতেন না," বলতে-বলতেই জানালার দিকে আঙুল দেখিয়ে পরক্ষণেই বললেন, "বলুন তো কী দেখছেন?"

প্রত্যুষ জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখল, একটা জেরিকেন-বোঝাই ভ্যানরিক্শা যাচ্ছে। তার গায়ে সাইনবোর্ড টাঙানো রয়েছে, 'আর্সেনিক-মুক্ত জল'।

প্রত্যুষ নিমেষে সুদীপডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলল, "লেখাই তো রয়েছে, আর্সেনিক মুক্ত জল।"

হেসে উঠে সুদীপডাক্তার বললেন, "আপনি 'গিলিগিলি গে' বলে ওই জেরিকেন-গুলোর ছিপি খুলুন গিয়ে। দেখবেন ওই ডিস্টিল্ড ওয়াটারগুলো দিয়ে ভকভক করে কী সুন্দর ঝাঁঝালো গন্ধ বেরচ্ছে।"

প্রত্যুষের মুখে অবিশ্বাস আর বিস্ময় দেখে সুদীপডাক্তার বললেন, "আরও আছে। শুনলে ভিরমি খেয়ে যাবেন মশাই। মাঝে-মাঝেই দেখবেন ভ্যানরিক্শা বোঝাই টিভি আর ফ্রিজ যাচ্ছে। ওগুলো শুধুই টিভি আর ফ্রিজের কার্টেন বাক্স। ভিতরে চোলাই। পাচারের প্যাঁচ-পয়জার কি কম? ভদ্রলোকের বাহনও আছে। মারুতি, অ্যাম্বাসাডর, ম্যাটাডোর, অবশ্য সেসব গাড়ির নাম্বার পুলিশের ডাকবাবুদের গোপন খাতায় লেখা আছে।"

"তার মানে কোনও প্রতিরোধ নেই!"
হো হো করে এবার অট্টহাসি হেসে সুদীপডাক্তার বললেন, "হাসালেন মশাই! কার বনের শেয়াল কে তাড়াবে বলুন? আরে মশাই, পুলিশ, পার্টি, আবগারি বিভাগ, তোলাবাজ সবাই মিলে এ লাইনে একটা মালগাড়ি। হপ্তা চুক্তিতে শুধুই ওয়াগন ভরে যাও।"
সুদীপডাক্তারের কথা শেষ হতে না-হতেই চেম্বার আলো করে এক সুন্দরী তরুণীর আবির্ভাব হল। প্রত্যুষের জীবনে এত সুন্দরী মেয়ে এত কাছে এই প্রথম। কলেজ-জীবনেও সে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, কিন্তু এত লাবণ্যময়ী নয়। আসলে মেয়েটা যত না সুন্দরী, তার চেয়ে অনেক বেশি লাবণ্যময়ী। মেয়েটার গায়ের রং খুব ফরসা নয়, তবে চাপাও নয়। আসলে মেয়েটার ত্বকের ঔজ্জ্বল্যর কাছে তার রংটা যেন হেরে বসে আছে। নাকটা বেশ টিকোলো। বাক্যহারা করে দেওয়ার জন্য তার সুন্দর অথচ বিষণ্ণ চোখদু'টিই যথেষ্ট।
মেয়েটাকে দেখেই সুদীপডাক্তার বললেন, "আরে এসো, এসো..."
তারপর প্রত্যুষের পাশের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, "বোসো।"
মেয়েটা চুড়িদারের ওড়না সামলে বসল।
সুদীপডাক্তার বললেন, "তারপর বলো, তোমার দাদু কেমন আছেন?"
মেয়েটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "জ্বরটা কিছুতেই একেবারে যাচ্ছে না! সকালে কমলে বিকেলে বাড়ছে। গতকাল রাতে আবার বমি করেছে।"
সুদীপডাক্তার এবার ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "এর জন্য তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না। এই জ্বরের ধরনটাই এরকম, ফ্লাকচুয়েট করে। আর দুটো দিন দ্যাখো। তোমার দাদু ঠিক ভাল হয়ে যাবেন। তুমি একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামীর নাতনি। তোমার এত ঘাবড়ে গেলে চলে? তুমি তো স্ট্রং মাইন্ডেড লেডি। তোমার দাদুর মুখে তো তোমার গুণের কথা কম শুনিনি। এত চিন্তার কিছু নেই। "
মেয়েটা এবার মৃদু হাসল।
প্রত্যুষের মনে হল কোথা থেকে মোনালিসার হাসিটা যেন এক টুকরো মেঘ হয়ে উড়ে-উড়ে এসে মেয়েটার মুখে লেগে গেল।
সুদীপডাক্তার এরপর একটা সাদা কাগজে একটা ট্যাবলেটের নাম লিখে বললেন, "এটা কিনে নিয়ো। দু' বেলা খাওয়ার পর দিয়ো।"
মেয়েটা এবার মানিব্যাগ থেকে ফিজের টাকা বের করতে গেলে সুদীপডাক্তার বললেন, "ব্যাগটা বন্ধ করো। তোমাকে তো আগেই বলেছি তোমার দাদুর মতো একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামীর চিকিৎসার জন্য আমি ফিজ নিতে পারব না।"
মেয়েটা চলে যাওয়ার পর প্রত্যুষ সুদীপডাক্তারকে বলল, "মেয়েটি কোনও স্বাধীনতা-সংগ্রামীর নাতনি?"
"হ্যাঁ, স্বাধীনতা সংগ্রামী মণিময় সেনগুপ্তর নাতনি। এ অঞ্চলের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি উনি। শুধু যে ব্রিটিশ পুলিশদের কাছে তিনি অত্যাচারিত হয়েছেন তা নয়, পরবর্তী সময়ে দুর্ভাগ্যেরও শিকার হয়েছিলেন। একটা দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতে একইসঙ্গে হারিয়েছিলেন নিজের স্ত্রী, একমাত্র সন্তান এবং বউমাকেও।"
"কীভাবে?" কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল প্রত্যুষ।
"সপরিবারে যাচ্ছিলেন উত্তর ভারত ভ্রমণে। যাওয়ার পথে ঘটল মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনা। স্ত্রী, সন্তান এবং বউমা মারা গেলেও বেঁচে রইলেন তিনি আর ১২ বছরের একমাত্র নাতনি। সেই থেকে ওরা দু'জনে আছেন। ওঁর নাতনি শুধু সুন্দরীই নয়, ত্যন্ত গুণীও। দাদু যেমন একসময় ছোট্ট নাতনিকে মানুষ করেছে, সেও আবার বড় হয়ে তেমনই দাদুর দেখভাল করছে। শুধু পড়াশোনাতেই মেধাবী নয়, রান্নাতেও পটু, গান জানে, ছবিও আঁকে। বাড়িতে কিছু গরিব ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে পড়ায়। একেবারে দাদু-অন্ত-প্রাণ। রিসেন্টলি গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। বলেছে দাদুকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। বাড়িতেই একটা কোচিং সেন্টার খুলবে। মেয়েটার নাম ভারী মিষ্টি। মৌপিয়া।"
একটু থেমে সুদীপডাক্তার প্রত্যুষকে বললেন, "আচ্ছা, আপনি বুঝি এখানে নতুন এসেছেন?"
"হ্যাঁ, একেবারে নতুন। শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে এসেছি।"
"কোন স্কুলে?"
"স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলে।"
"তা বেশ। আপনারাই তো দেশটাকে নতুন করে গড়বেন। নতুন করে সমাজ সংশোধন করবেন।"
প্রত্যুষ বলল, "আপনার এই বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ। দরকার পড়লে আবার আসব।"
তারপর ফিজ মিটিয়ে নিলুকে নিয়ে মহীতোষবাবুর বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

॥ ৪ ॥

ঠিক স্কুলে যাওয়ার সময় সেক্রেটারি দেবদুলাল চক্রবর্তীর ফোনটা পেল প্রত্যুষ। তখনও ঘর ছাড়েনি। শেষবারের মতো আয়নায় নিজের মুখটা দেখে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখনই বেজে উঠল মোবাইলের সুরেলা রিংটোনটা। মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে চোখ রাখতেই ভেসে উঠল দেবদুলালবাবুর নাম।
মোবাইলটা কানে নিয়ে প্রত্যুষ বলল, "হ্যাঁ, বলুন কাকু।"
প্রত্যুষ দেবদুলালবাবুকে 'কাকু' বলেই সম্বোধন করে। এটা দেবদুলালবাবুর ভালবাসার নির্দেশ। প্রথমদিনই দেবদুলালবাবু প্রত্যুষকে বলেছিলেন, "তুমি আমাকে 'কাকু' বলেই ডাকবে। তোমার মুখে 'কাকু' ডাকটাই আমার ভাল লাগবে।"
প্রত্যুষ অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই টের পেয়েছিল দেবদুলালবাবু বেজায় রসিক মানুষ। এলাকার এক ভীষণ জনপ্রিয় মানুষ। একজন সমাজকর্মী। পাড়ার ক্লাবের সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত। পাড়ার রক্তদান শিবিরের মূল উদ্যোক্তা দেবদুলালবাবুই। সরল এবং আমুদে মানুষ। মানুষকে হাসাতে ওস্তাদ। এমন-এমন সব কথা বলেন, না হেসে উপায় নেই। বলেন, "জীবনে ক'টা বছরই বা বাঁচব! তার মধ্যে যদি মুখ গোমড়া করে বসে থাকি সেটা তো জীবনেরই অপচয়। জান তো, যদিও একজন কার্ডিওলজিস্ট কান্না সম্বন্ধে আশার বাণী শুনিয়েছেন, 'ইফ মেন কুড ওনলি ক্রাই, দ্য ইনসিডেন্স অফ হার্ট অ্যাটাকস্ ইন দেম কুড বি ড্রামাটিক্যালি রিডিউসড,' কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, 'লাফ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড লাফস উইথ ইউ। উইপ অ্যান্ড ইউ উইপ অ্যালোন।' "
দেবদুলালবাবু যেমন রসিক, প্রশাসক হিসেবেও তেমনই দক্ষ। স্কুলের পরিচালন সমিতির যাবতীয় কাজে তাঁর অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি। ভীষণ সৎ, ন্যায়পরায়ণ। প্রত্যুষের মোবাইলে দেবদুলালবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আজ শনিবার, হাফ ছুটি। ছুটির পরই আমার বাড়ি চলে আসবে। আশা

কলেজ-জীবনেও সে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, কিন্তু এত লাবণ্যময়ী নয়। আসলে মেয়েটা যত না সুন্দরী, তার চেয়ে অনেক বেশি লাবণ্যময়ী। মেয়েটার গায়ের রং খুব ফরসা নয়, তবে চাপাও নয়।

করি বিকেলটা আমার বাড়িতে তোমার ভালই কাটবে। নতুন অতিথির সঙ্গে কথা বলতে কার না ভাল লাগে, সে অতিথি যদি আবার হয় সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ, অন্য প্রকৃতির, অন্য আঙ্গিকের, অন্য রূপের, তবে তো সোনায় সোহাগা। তবে চোখ ধাঁধিয়ে যেন না যায়। তুমি এসো কিন্তু," বলেই দেবদুলালবাবু ফোন কেটে দিলেন।

স্কুলের পথে যেতে-যেতে প্রত্যুষ ভেবে পেল না কীসের জন্য দেবদুলালবাবুর কাছ থেকে এভাবে ডাক এল। হেঁয়ালি করা মানুষদের প্রত্যুষের দুর্বোধ্য লাগে। অবশ্য রসিক মানুষরা বেশির ভাগই হেঁয়ালিপ্রিয়। এ অভিজ্ঞতা প্রত্যুষের আছে। প্রত্যুষের বাবার বন্ধু রাসমোহন দত্ত এরকম একজন মানুষ। বেজায় হাসিখুশি মানুষ। কথায়-কথায় হাসান। একদিন প্রত্যুষকে বলেছিলেন, "আচ্ছা প্রত্যুষ, তোমরা কলেজে প্রফেসরদের পুরো নাম উচ্চারণ না করে, নাম-পদবির আদ্যাক্ষর দিয়ে সম্বোধন কর, তাই না? ভাগ্যিস বাংলায় বল না। তা হলে কেলোর কীর্তি হয়ে যেত।"

প্রত্যুষ বলেছিল, "কী রকম?"

রাসমোহন দত্ত হেসে বলেছিলেন, "এই ধরো যেমন 'কুন্তলকুমার রক্ষিত' নাম পদবির আদ্যাক্ষরে হয়ে যেত 'কুকুর'। 'পাঁচকড়ি ঠাকুর' হয়ে যেত 'পাঁঠা'। 'বসন্তললিত দত্ত' হয়ে যেত 'বলদ'। 'সায়ন্তনপণ্ডিত' হত 'সাপ'। 'কাজলকর্মকার' হয়ে যেত 'কাক' কিংবা 'শশাঙ্ককুমার নন্দী' হয়ে যেত 'শকুন'। আবার ধরো 'ডালিমকান্তি তরফদার' হয়ে যেত 'ডাকাত' কিংবা 'হারান রাম মিত্র' হয়ে যেত 'হারামি'..." এ কথায় প্রত্যুষের হাসতে-হাসতে পেট ফেটে যাওয়ার জোগাড়।

ক'টা দিনের মধ্যে প্রত্যুষ দেবদুলালবাবুর নিকটাত্মীয়ের মতো হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই দেবদুলালবাবু প্রত্যুষকে তাঁর বাড়িতে থাকতে বলেছিলেন, "আমি তো এখন ঝাড়া হাত-পা। একমাত্র সন্তান হিমাংশু। এখন ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে সেটলড্। বাড়িতে আমরা শুধু পঞ্চাশোর্ধ্ব শুক-সারী কাপ্‌ল। পুরো একতলাটা ফাঁকা আছে। চাইলে তুমি দোতলার ঘরেও থাকতে পার।"

প্রত্যুষ বলেছিল, "না কাকু, আপাতত যেখানে আছি, সেখানেই থাকার ইচ্ছে। মহীতোষবাবুরা সত্যি ভাল লোক। এখন আমি ওঁদের ছেড়ে গেলে ওঁরা আঘাত পাবেন। তা ছাড়া, আশ্রমের ছেলেগুলোও এখন আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না। ওদের মানুষ করার ভার আমিও নিয়েছি।"

দেবদুলালবাবু হেসে বলেছিলেন, "তুমি সত্যি বুঝদার ছেলে। আজকের দিনে পরের জন্য ভাবা ব্যাপারটা ব্যতিক্রম বইকী! আমি প্রথমদিনই বুঝেছি আমাদের স্কুল এক আদর্শ শিক্ষক পেয়েছে। তুমি ঠিক আমাদের স্কুলকে একটা বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারবে তোমার কাজ দিয়ে।"

দেবদুলালবাবুর সেই কথাগুলো প্রত্যুষের মনের খাতায় আজও জ্বলজ্বল করছে। ভবিষ্যতেও করবে। প্রত্যুষকে যেমন দেবদুলালবাবুর খুব ভাল লাগে, প্রত্যুষেরও তেমনই দেবদুলালবাবুকে অত্যন্ত কাছের মানুষ মনে হয়। বেশ কয়েকদিন স্কুল-সংক্রান্ত কাজের ব্যাপারে প্রত্যুষ দেবদুলালবাবুর বাড়ি গিয়েছে। তিন বিঘে জমি জুড়ে দেবদুলালবাবুদের বাড়ি। এক বিঘে জুড়ে ফুল আর তরিতরকারির বাগান। তবে বাড়ির সামনের অংশে শুধুই ফুলের বাগান। তাতে বিভিন্ন জাতের ফুলগাছ বোঝাই। তার মধ্যে অনেক নাম-না-জানা ফুলগাছও আছে। বাড়ির পিছনে যেখানে তরিতরকারির বাগান সেখানে লঙ্কা, বেগুন, লাউ, সিমগাছ সহ বেশ কিছু আনাজপাতির সম্ভার আছে। একেবারে পিছন দিকটায় শানবাঁধানো একটা ছোট্ট পুকুর। তাতে অনেকরকমের মাছ। একধরনের মাছ সবসময় ভেসে বেড়ায়। নাম 'ভাসা মাছ।' যখন সারা পুকুরে ভেসে বেড়ায় কী সুন্দর লাগে দেখতে! শানবাঁধানো পুকুর ঘাটটায় বসতে প্রত্যুষের ভীষণ ভাল লাগে। দেবদুলালবাবুর প্রতিটি কথা যেন মেপে-মেপে বলা, তা রসিকতা করার সময় হোক বা কিছু বোঝানোর সময় হোক। কিন্তু আজ যে কীসের জন্য বিকেলে যেতে বললেন, তা ভেবে পেল না প্রত্যুষ।

স্কুল ছুটি হওয়ার পরই প্রত্যুষ ছুটল দেবদুলালবাবুর বাড়ি। যথারীতি হাসিমুখে ঘরে ডেকে বসালেন দেবদুলালবাবু। কিছু পরে দেবদুলালবাবুর স্ত্রী হাতে দুটো খাবারের প্লেট নিয়ে ঢুকলেন। একটা প্লেটে সাজানো গরম রাধাবল্লভী আর অন্যটায় ছোলার ডাল। অন্য প্লেটে কয়েকটা মিষ্টি।

প্রত্যুষ বলল, "কাকিমা এসব করেছেন কী! এ যে বিশাল আয়োজন!"

"বিশাল আর কোথায়? ক'টা তো মাত্র রাধাবল্লভী আর মিষ্টি। এখনই তো তোমার খাওয়ার বয়স। তোমার মতো বয়সে তোমার কাকু কত খেত জান? এর তিন গুণ।"

দেবদুলালবাবু বললেন, "এই শুরু হল তোমার কাকিমার লেগপুলিং। আমার মতো সজনে ডাঁটা মার্কা শরীর নিয়ে কত আর খাওয়া যায় বলো তো? তোমাকে বসিয়ে খাওয়াবে বলেই প্রকারান্তরে আমাকে নররাক্ষস বলে ঠেস দেওয়া।"

প্রত্যুষ হেসে উঠল। দেবদুলালবাবু এবার তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "কই গো, এবার তোমার সাধের বোনঝিকে পাঠিয়ে দাও। কথাবার্তা বলে একটু সড়গড় হোক। রিসার্চওয়র্ক করা তো চাট্টিখানি কথা নয়, যা কিছু হেল্প প্রত্যুষই করতে পারবে। যা একখানা আলট্রামডার্ন মেয়ে, আমি ট্যাকল করতে পারব না।"

কিছু পরেই দেবদুলালবাবুর স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন তার বোনঝিকে নিয়ে। তারপর হেসে বললেন, "এই আমার ছোটবোনের একমাত্র মেয়ে। এখন নিউইয়র্কে থাকে। ওখানেই পড়াশোনা করে। আমার এখানে এখন ক'দিন থাকবে ওর রিসার্চওয়র্কের জন্যে। নাও তোমরা কথা বল। আমি যাই..." বলেই দেবদুলালবাবুর স্ত্রী চলে গেলেন।

দেবদুলালবাবু এবার বললেন, "আমার ছোট ভায়রাভাই ওখানকার একজন ইঞ্জিনিয়র। ছোট শ্যালিকা অবশ্য হোম-মেকার। আর আমার গিন্নির এই অ্যাটম বোমা বোনঝিটি হল টু-ইন-ওয়ান, গুণে লক্ষ্মী, রূপে সরস্বতী। নাম পামেলা... এর জুড়ি মেলা ভার।"

"মেসো ভাল হবে না বলছি। এভাবে কেউ ইনট্রোডিউস করায়? তোমার স্বভাবটা আর বদলাল না..." কপট রাগ প্রকাশ করল পামেলা।

"আরে আমি অভদ্রভাবে কী বললাম! ঠিক আছে বাবা, জোক্‌স অ্যাপার্ট। প্রত্যুষ তোমাকে যা বলছিলাম, পামেলা বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে এবার একটা নতুন রিসার্চওয়র্কে নেমেছে। ওর সাবজেক্ট ছিল সোশিওলজি। এখন ও একটা গবেষণা করতে চায় নিরাশ্রয় শিশুদের সমস্যা এবং শিশুশ্রমিকদের নিয়ে। বেশ কিছুদিন ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাটি করেছে ও এইসব নিয়ে। শেষে আমিই বলেছি এভাবে ইন্টারনেট ঘেঁটে তো আর কিছু হয় না, প্র্যাকটিকাল ফিল্ডে নেমে খোঁজখবর নেওয়ার কোনও বিকল্প নেই। তাই ওকে ইনভাইট করে ডেকে এনেছি মাতৃভূমিতে। পায়ে-পায়ে হেঁটে এবার দেখবে নিরাশ্রয় শিশুদের প্রকৃত সমস্যাটা কী এবং কীভাবে শিশুশ্রমিকেরা ঘাড় গুঁজে অক্লান্তভাবে খেটে দিন গুজরান করছে।"

একটু থেমে দেবদুলালবাবু এবার প্রত্যুষের দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রত্যুষ এ ব্যাপারে কিন্তু তোমাকে ওকে সাহায্য করতে হবে। তুমি কয়েকটা দিন ওকে একটু সঙ্গ দিয়ো। ও তো এখানকার পথঘাট, পরিবেশ কিছুই চেনে না। দশবছর পর আমাদের বাড়িতে এল।"

প্রত্যুষ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

॥ ৫ ॥

রিক্‌শা থেকে নেমে পথে যেতে-যেতে মহীতোষবাবু মনের ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিলেন আর পাশে হাঁটতে-হাঁটতে প্রত্যুষ তা একমনে শুনছিল। একসময় মহীতোষবাবু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "এখন আর কারও মনই উদার নয়। এখন আর কেউ পরের জন্য কিছু করায় বিশ্বাসী নয়।"

প্রত্যুষ বলল, "আসলে যুগধর্ম পালটে গিয়েছে তো, তাই অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে। মানুষ এখন নিজের সমস্যা নিয়ে এমনভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে, যে অন্যের কথা ভাবার সময়ই নেই।"

"এ যুগের কর্মব্যস্ততার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এভাবে তো আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। অনীহার আঁশটে গন্ধ লুকোবে কোথায়? আসলে এ যুগের ছেলেমেয়েরা ক্রমশই রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, শুধু ঘটা করে জন্মদিনটুকুই যা করে। না হলে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথদের কথা মনে রাখত। তাঁর পরোপকারের আদর্শের কথা বলেছিলেন," তারপর মহীতোষবাবু একটু থেমে বললেন, "আজ এইসব কথা বলছি কেন জান? আজ তোমাকে যার কাছে নিয়ে যাচ্ছি, তিনি এমন একজন মানুষ যে, তাঁর জীবনের কাহিনি শুনলে শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হয়ে আসে। তিনি আমার একসময়ের শিক্ষক। তাঁর সঙ্গে কথা বললে জানতে পারবে পরোপকারের প্রকৃত অর্থ কী। অথচ তাঁর জীবনের শেষাংশটা ভীষণ ট্র্যাজেডির। অনেকদিন তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই, তাই তোমাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

কথা বলতে-বলতে মহীতোষবাবু একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। একতলা বাড়িটা। সামনে একটা ছোট্ট বাগান। কিছু তরিতরকারির গাছ লাগানো। কয়েকটা বেগুনগাছে বেগুন ফলে রয়েছে। লঙ্কাগাছগুলোতেও লঙ্কা বোঝাই হয়ে রয়েছে। চার-পাঁচটা পেঁপে গাছে বেশ পেঁপের ফলন হয়েছে। দুটো দোয়েল পাখি ঠুকরে-ঠুকরে পেঁপে খাচ্ছে। বাড়ির সদর দরজাটা বন্ধই ছিল। দরজায় টোকা দেওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর যে দরজাটা খুলল, তাকে দেখে প্রত্যুষের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। সুদীপডাক্তারের চেম্বারের সেই মেয়েটা না? প্রত্যুষের বুকের ভিতর কীসের যেন আলোড়ন উঠল। গোপন সুনামির প্রাবল্যে ভেসে যেতে-যেতে হঠাৎ প্রত্যুষের হুঁশ ফিরে এল। মেয়েটার নাম প্রত্যুষ ভুলতে পারেনি। ওই নাম কি ভোলা যায়? মৌপিয়া!

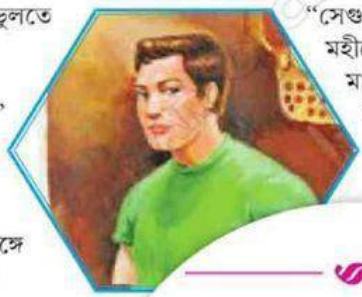

মৌপিয়া মহীতোষবাবুকে দেখেই বলল, "মহীতোষকাকু! কতদিন পর এলেন! আসুন, আসুন।"

মহীতোষবাবু মৌপিয়াকে দেখিয়ে বললেন, "যাঁর সঙ্গে দেখা করব বলে আজ এখানে এসেছি তিনি এরই দাদু..."

মহীতোষবাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রত্যুষ সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "স্বাধীনতা সংগ্রামী মণিময় সেনগুপ্ত। এই অঞ্চলের শ্রদ্ধেয়তম মানুষ, তাই না?" বলে মৃদু হাসল।

মহীতোষবাবু বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "তুমি জানলে কেমন করে?"

মৌপিয়াও অবাক বিস্ময়ে প্রত্যুষের দিকে তাকালে প্রত্যুষ একটু হেসে বলল, "জেনেছি সুদীপ ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে।"

তারপরই সুদীপডাক্তারের চেম্বারে মৌপিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা খুলে বলল।

মৌপিয়া দাদুর ঘরে ওদের পৌঁছে দিয়ে বলল, "আপনারা কথা বলুন। আমি ততক্ষণে একটু চা করে নিয়ে আসি।"

মৌপিয়া রান্নাঘরে চলে যাওয়ার পর মণিময়ের ঘরটা একপলক পর্যবেক্ষণ করল প্রত্যুষ। বেশ সুন্দর করে গোছানো। তাক ভরা বিভিন্ন বিষয়ের বই। টেবিলের উপর কিছু ওষুধের প্যাকেট। ঘরের কোণে ছোট একটা টিভি।

মহীতোষবাবু প্রত্যুষের পরিচয় দেওয়ার পর প্রত্যুষ মণিময়বাবুর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল। মণিময়বাবু বিছানায় শুয়েছিলেন। ওদের দেখেই উঠে বসলেন।

মহীতোষবাবু বললেন, "মাস্টারমশাই, আপনি যে অসুস্থ এ কথা যদি জানতে পারতাম, আগেই আসতাম।"

"না, না, তেমন অসুস্থ তো হইনি। সামান্য জ্বর। তা ছাড়া এ বয়সে সবসময় সুস্থ থাকা যায় নাকি? বয়সই বা ছাড়বে কেন?"

প্রত্যুষ বলল, "আপনার ঘরটা কিন্তু বেশ গোছানো। দেখলেই বেশ ভাল লাগে।"

মণিময়বাবু মৃদু হেসে বললেন, "সবই আমার নাতনির দৌলতে। ওই তো এখন এ সংসারের হাল ধরে আছে। সবকিছু দেখাশোনা করে। রান্নাবান্না, ঘর গোছানো থেকে বাইরের সব কাজও একাই করে। তার উপর বাড়িতে একগাদা বাচ্চাদের পড়ায়। একেবারে মা দুর্গা। দু'হাতে একাই দশ হাতের কাজ করে। গান করে, ছবি আঁকে। কী যে না করে সেটাই ভাবার!"

মহীতোষবাবু বললেন, "মৌপিয়া মামণি করবে না তো কে করবে? কার নাতনি দেখতে হবে তো!"

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলার পর মৌপিয়া দু'হাতে দুটো প্লেটে দুটো ওমলেট নিয়ে এল।

মহীতোষবাবু বললেন, "আবার এসব কেন? শুধু চা-বিস্কুট আনলেই তো হত।"

"এতদিন পরে এলেন। শুধু চা-বিস্কুট কি দিতে পারি?" বলেই মৃদু হাসল মৌপিয়া। তারপর প্লেট দুটো রেখে বলল, "আমি জল আর চা নিয়ে আসি।" একঢাল চুল নাচিয়ে মৌপিয়া চলে যাওয়ার পর প্রত্যুষ ভাবল, মৌপিয়া সত্যিই করিৎকর্মা। না হলে কি এত দ্রুততায় দুটো ওমলেট বানানো যায়?

ওমলেট, চা খাওয়া হলে মহীতোষবাবু মৌপিয়াকে বললেন, "তোমাকে যে মেহগনির চারাগাছগুলো দিয়েছিলাম, সব বেঁচেছে তো?"

"হ্যাঁ। আর গন্ধরাজ লেবুর গাছটাতেও ফুল এসেছে।"

"আর যে চারটে নারকেল গাছ দিয়েছিলাম?"

"সেগুলোও বেশ বড় হয়েছে। দেখবেন?"

মহীতোষবাবু প্রত্যুষকে বললেন, "তুমি ততক্ষণে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে গল্প করো। আমি একটু মৌপিয়ার সঙ্গে ওদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের ভিটেটা দেখে আসি। যে গাছগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো কতটা বড় হয়েছে, দেখতে মনটা উসখুস করছে।"

কয়েকটা বেগুনগাছে বেগুন ফলে রয়েছে। লঙ্কাগাছগুলোতেও লঙ্কা বোঝাই হয়ে রয়েছে। চার-পাঁচটা পেঁপে গাছে বেশ পেঁপের ফলন হয়েছে। দুটো দোয়েল পাখি ঠুকরে-ঠুকরে পেঁপে খাচ্ছে।

মহীতোষবাবুকে নিয়ে মৌপিয়া চলে যাওয়ার পর প্রত্যুষ মণিময়বাবুর কাছে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয়তার কথা শুনতে চাইল। বলল, "আপনি তো একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন..."

প্রত্যুষের কথা শেষ হতে না দিয়ে মণিময়বাবু বললেন, "না, না, সে তেমন কিছু নয়। আমি স্বাধীনতা সংগ্রামের সামান্য একজন পিয়ন ছিলাম।"

"পিয়ন! তার মানে!"

"পিয়ন মানে পত্রবাহক। বিপ্লবীদের গুরুত্বপূর্ণ চিঠিগুলো আমিই আদানপ্রদান করতাম। সক্রিয় বিপ্লবীদের মতো অস্ত্র চালাবার শক্তিই ছিল না আমার।"

"কেন?"

"আসলে ছোটবেলা থেকে আমার হাতদুটো পোলিও রোগাক্রান্ত হওয়ার ফলে কোন হাতেই জোর পেতাম না।"

"আপনি কোনওদিন ধরা পড়েননি?"

"ধরা আবার পড়িনি?" বলেই মণিময়বাবু মৃদু হাসলেন।
"চিঠি সমেত ধরা পড়েছেন?"
"হ্যাঁ। বহুবার। তবে প্রতিবারই ধরা পড়ার আগেই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিগুলো আমি গিলে নিতাম। ফলে প্রমাণ কিছু থাকত না।"
"ওরা মারত না?"
"মারত না আবার? আমার এই দু'হাতের দশ আঙুলের নখের মধ্যে কতবার যে পিন ফুটিয়ে দিয়েছে।"
"পোলিও-আক্রান্ত দুটো হাত দেখেও ওদের দয়া হত না?"
"দয়া! সে সময় ওদের অভিধানে দয়া মানে ছিল দমন করা। ওদের অত্যাচারের এফেক্টটা আমি আজও পাই।"
"কীরকম?"
"দু'হাতের এই আঙুলগুলো আজও মাঝে-মাঝে বেঁকে যায়। স্নায়ুগুলো তো কম আঘাত পায়নি। তখন ভীষণ যন্ত্রণা হয়।"
"ডাক্তার দেখাননি?"
"হ্যাঁ। ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যায়। কয়েকমাস পর সুযোগ পেলে আবার চাগিয়ে ওঠে।"
হঠাৎ প্রত্যুষ মহীতোষবাবুর গলার আওয়াজ পেল। দক্ষিণদিকের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখল মহীতোষবাবু তাকে ডাকছেন।
মণিময়বাবু বললেন, "দ্যাখো তো কেন ডাকছে। হয়তো কিছু দেখাবে বলে। বাপ-মা হারানো মেয়েটা মনের আনন্দে যা করে তাতেই সায় দিই। একবার দেখে এসো কেন ডাকছে।"
দক্ষিণদিকের বাগানে যেতেই মহীতোষবাবু প্রত্যুষকে একটা আমগাছের দিকে তাকাতে বললেন।
প্রত্যুষ সেদিকে তাকিয়ে অবাক। এত বড় মৌচাক সে জীবনে দেখেনি। প্রায় একটা জার্সি গরুর পেটের মত সুবিশাল মৌচাকটা একটা বড় আমডালে ঝুলে আছে। আর তার গায়ে কয়েক হাজার মৌমাছি লেপ্টে আছে। প্রত্যুষ অস্ফুটে বলল, "বাবা! এত বড় মৌচাক!"
মহীতোষবাবু হেসে বললেন, "বলো তো, মৌচাকটায় কত কেজি মধু পাওয়া যাবে?"
প্রত্যুষ একটু ভেবে বলল, "মোটামুটি কুড়ি-পঁচিশ কেজি।"
মহীতোষবাবু হেসে বললেন, "অন্তত চল্লিশ কেজি, তার কম হবে না," তারপর মৌপিয়াকে বললেন, "চাক ভাঙলে আমাকে খাঁটি মধু দিয়ো। অনেক কবিরাজি ওষুধের সঙ্গে মধু খেতে হয়।"
প্রত্যুষ বলল, "চাকভাঙার দিন আমাকে একটু নিয়ে আসবেন?"
মহীতোষবাবু বললেন, "এখনও নিয়ে আসতে হবে? মৌপিয়াদের বাড়ি তো চিনে গেলে। এখন ইচ্ছে হলেই চলে আসবে। মৌপিয়াও বাচ্চাদের ভীষণ ভালবাসে। তুমি এলে ওরও নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।"
একটু থেমে মৌপিয়ার উদ্দেশ্যে মহীতোষবাবু বললেন, "প্রত্যুষ কিন্তু চমৎকার পড়ায়। বাচ্চাদের ভীষণ ভাল ট্যাক্‌ল করতে পারে। আমার বাড়ির আশ্রমের অনাথ শিশুদের কাছে তো ও এখন চোখের মণি।"
প্রত্যুষ বলল, " 'অনাথ' শব্দটায় আমার আপত্তি আছে কারণ আমরা অনাথ বলতে বুঝি অসহায়। কিন্তু দেখলে বোঝা যাবে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু নিজস্ব গুণ বা ক্ষমতা আছে। ভাগ্যের ফেরে যারা অসহায়, তাদের সঠিক পথটা চিনিয়ে দিতে হয়, আন্তরিক ইচ্ছে থাকলে সে অবশ্যই স্বনির্ভর হতে পারে, " একটানা কথাগুলো বলে প্রত্যুষ থামল।
মহীতোষবাবু বললেন, "দেখলে তো মৌপিয়া? বয়স তিরিশের কোঠায়, অথচ কথা বলছে যেন কোনও বয়স্ক মানুষ। ওর মুখের এসব চমৎকার কথাগুলো শুনলে যেন মনে হয়, নতুন করে ভাবতে শিখলাম।"
প্রত্যুষ পকেট থেকে এবার মোবাইলটা বের করে মৌপিয়াকে বলল, "আমি ওই মৌচাকটার একটা ছবি তুলব?"
মহীতোষবাবু বললেন, "ওর হয়ে আমিই অনুমতি দিচ্ছি ছবি তোলার। তবে মৌচাকের ছবি তোলার সঙ্গে ওর গোলাপ-বাগানটারও একটা ছবি তুলে নিয়ো। ওর গোলাপ-বাগানটা দেখলে মন ভরে যাবে।"
প্রত্যুষ আর মৌপিয়াকে সঙ্গে নিয়ে মহীতোষবাবু এবার তাদের গোলাপ-বাগানে এলেন।
চারিদিকে বিভিন্ন জাতের গোলাপ দেখে প্রত্যুষের মন ভরে গেল। মৌপিয়া গোলাপ-বাগানের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে প্রত্যুষকে কোনটা কোন গোলাপ চেনাতে লাগল।
তন্ময় প্রাণভরে মোবাইলে সেসব গোলাপের ছবি তুলতে লাগল, মৌপিয়ারও ছবি তুলল কয়েকটা। মহীতোষবাবু ততক্ষণে বেশ খানিকটা এগিয়ে মেহগনি গাছ দেখছিলেন।
প্রত্যুষের গোলাপফুলের ছবি তোলার মাঝে মৌপিয়া এগিয়ে এসে বলল, "এই গোলাপ-বাগানের মধ্যে এভাবে যে আমার ফোটো তুললেন, তাতে যে খুঁত থেকে গেল। প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের মধ্যে আমি কিন্তু একেবারে বেমানান।"
প্রত্যুষ বলল, "আপনার বিনা অনুমতিতে আপনার ফোটো তুললাম, এটা আমার দোষ হতে পারে। কিন্তু বেমানান কথাটা আমি মানব না।"
"বেমানানই তো। আমার মতো একজন অপয়া মেয়েকে এই গোলাপ-বাগানে মানায় না।"
"বাপ-মা হারালেই যে অপয়া হতে হয়, একথা আপনাকে কে বলল? পিতৃমাতৃহীন হওয়াটা নিছক ভাগ্য বিপর্যয় ছাড়া কিছু নয়। মানুষের জীবন সুখ-দুঃখ নিয়েই তৈরি। জীবনের সঠিক ব্যবহারই জীবনকে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা দেখায়।"
"আপনি সত্যি খুব ভাল কথা বলতে পারেন," বলেই মৌপিয়া মুখ নিচু করল।
"তা হলে অনুমতি দিচ্ছেন? আমার মোবাইলে আপনার ছবি থাকলে কোনও আপত্তি নেই?"
"আপত্তি আছে।"
প্রত্যুষ এবার বিব্রত বোধ করল। এতক্ষণে হাসিখুশি মুখটা যেন ঝাড়বাতির ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে টুনিলাইটের মতো টিমটিমে হয়ে গেল।
মৌপিয়া বলল, "আমি কোনওদিন কাউকে আঘাত দিতে চাই না। তবে আবার আপনি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করলে আপনার মোবাইলের ফোটো গ্যালারি থেকে গোলাপ-বাগানের গোটা অংশটাই ডিলিট করে দেব।"

॥ ৬ ॥

হিন্দু মিলন মন্দিরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পিছন থেকে ডাক শুনে প্রত্যুষ থমকে দাঁড়াল।
"এই যে দাদা, শুনছেন..."
হিন্দু মিলন মন্দিরের ঠিক সামনেই একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। আর তার নীচেই একটা লম্বা মুলিবাঁশের বেঞ্চ। এই ঠেকেই ছেলেগুলো থাকে। এর আগে যে ক'টা দিন এখান দিয়ে গিয়েছে, প্রত্যুষের চোখে পড়েছে ছেলেগুলো বসে আছে। ছেলেগুলোকে দেখে প্রত্যুষের মনে হয়েছে আপাতভদ্র। শুধু ঠেকে বসে নিজেদের মধ্যে ইয়ার্কি মারে। ইভটিজ়ার নয়। হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে একটা প্যাঁকাটিমার্কা ছেলে আবার তাকে ডাকল, "এই যে দাদা, শুনছেন?"
প্রত্যুষ এবার তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, "তোমরা কি আমাকে কিছু বললে?"
ছেলেটা এবার বলল, "হ্যাঁ দাদা, আপনাকেই বলছি, আপনি কি আমাদের গ্রামে নতুন এসেছেন?"
"হ্যাঁ।"
"তা কোথায় উঠেছেন?"
"মহীতোষবাবুর বাড়ি।"
"তা কী করেন? গভর্নমেন্ট সার্ভিস না প্রাইভেট?"

"আমি স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলে শিক্ষক হয়ে এসেছি।"
"তার মানে নিউলি অ্যাপয়েন্টেড?"
"হ্যাঁ। তোমার নাম?"
"রূপেন," এতক্ষণ ধরে প্রশ্ন করার পর রূপেন এবার থামল।
রূপেন এবার তার বন্ধুদের চিনিয়ে দেয়, "এই হল তাপস, শ্যামল, চণ্ডী। আর ওই হল বিল্টু, শিবানন্দ। আর ওর নাম মৃত্যুঞ্জয়।"
প্রত্যুষ ওদের সঙ্গে সহজ হওয়ার চেষ্টায় বলল, "তোমাদের সঙ্গে আমারও আলাপ করার ইচ্ছে ছিল।"
শ্যামল বলল, "আমাদের মত বিবিসি-দের সঙ্গে আবার আলাপ! হাসালেন মাইরি। সরি, একটা ওয়াইড বল হয়ে গেল।"
"ওয়াইড বল মানে?" এবার বিস্মিত হল প্রত্যুষ।
চণ্ডী বলল, "ওই 'মাইরি' বলাটা উচিত হয়নি। তাই ও ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি কিছু মনে করবেন না।"
"না, না, আমি কিছু মনে করিনি। তা ছাড়া আমি ওয়াইড বলে ব্যাট ছোঁয়াই না।"
তাপস বলল, "বাহ! বেড়ে বললেন তো দাদা!"
প্রত্যুষ এবার সবাইকে একনজরে দেখে বলল, "সব প্রশ্নের তো সঠিক জবাব দেওয়া যায় না। এই যেমন বিবিসি মানে তো ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন। কিন্তু তোমরা নিশ্চয় অন্য অর্থে মিন করতে চাইছ। মানে রক ল্যাঙ্গোয়েজে যেমন বলে আর কী।"
বিল্টু বলল, "এই তো দাদা, আপনি রিয়েলি ব্রিলিয়ান্ট! ঠিক ধরেছেন। আমরা খোদ পশ্চিমবঙ্গের বিবিসি। মানে বেকার বাঙালি কমিউনিটি।"
স্থূলকায় মৃত্যুঞ্জয় বলল, "আমাদের মতো ভ্যাগাবন্ডদের সঙ্গে কথা বলে মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন। জানেন না, বেকাররা হল সমাজের বাড়তি ফালতু অংশ।"
"জীবনটাকে কখনও ফালতু ভাবতে নেই। মানুষের জীবনে সবসময় আশার আলোটাকে জ্বালিয়ে রাখতে হয়।"
তাপস বলল, "আপনি কি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনবেন নাকি? আমরা বসে আর আপনি দাঁড়িয়ে, কেমন যেন দেখায়।"
"না, না। ঠিক আছে। তোমরা ঠিক থাকলেই হল।"
"আমরা যখন এই ঠেকে থাকি, তখন সবাই ঠিকই থাকি। কিন্তু ঘরের মধ্যে যখন থাকি তখন মনে হয়..." বলেই শ্যামল হঠাৎ থামল।
"কী হল থামলে কেন? বলো কী মনে হয়?" প্রত্যুষ এবার আগ্রহ প্রকাশ করল।
"তখন মনে হয় আমাদের অস্তিত্বটা ঠিক শার্টের কলারের বোতামের মত, থেকেও যার ব্যবহার নেই।"
শিবানন্দ বলল, "শ্যামল, তোর কথায় আমি একমত। আমাদের ঠেকের মতো এত ভাল আর শান্তির ঠেক হয় নাকি? বাড়িতে থাকা মানেই তো উঠোনের নারকেল গাছের মত ঠায় মুখ বুজে বোবা হয়ে থাকা আর গুরুজনেরা সেই সুযোগে কাঠঠোকরার মত ঠোক্কর মেরেই চলে। দিনরাত ঠোক্কর হজম করা কি চাট্টিখানি কথা?"
মৃত্যুঞ্জয় এবার তার পেটটায় হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, "তোরা কিন্তু সেই থেকে নিজেরা নিজেদের হ্যাটা করে চলেছিস। আমি কিন্তু ওয়েট কমাতে রাজি নই।"
শ্যামল বলল, "তুই নিজের ওয়েট কবেই বা কমাতে চেয়েছিস? যা একখানা মধ্যপ্রদেশ বানিয়েছিস, তাতে গোটা রাজ্যের ফুড কর্পোরেশনের গোডাউনগুলো ঢুকে যাবে।"
কপট রেগে মৃত্যুঞ্জয় বলল, "এই দ্যাখ, সবসময় ফালতু কথা বলিস না। আমি কি সেই ওয়েট কমানোর কথা বলেছি নাকি? আমি বলতে চাইছি আমরা অতটা ইয়ে, মানে হেলাফেলার নয়।"
প্রত্যুষ একটু আগেও শ্যামলের কথা শুনে মনে-মনে হাসছিল। এবার মৃত্যুঞ্জয়ের কথায় সায় দিয়ে বলল, "ঠিক কথা। এই সমাজে প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব ভূমিকা থাকে। কারও কম, কারও বেশি। সে যাই হোক, তোমরা কে কতদূর পড়াশোনা করেছ জানতে পারি কি?"
মৃত্যুঞ্জয় বলল, "এই তো দাদা লুপ হোল এ ইয়র্কার বল ফেললেন। এই বল আমরা কখনও খেলতে চাই না।"
শ্যামল বলল, "অত ভণিতা না করে বলেই ফ্যাল না... দাদা যখন জানতে চেয়েছেন।"
মৃত্যুঞ্জয় বলল, "আমাদের মধ্যে তাপস আর বিল্টু কেএমজি। শ্যামল আর শিবানন্দ এইচজি। চণ্ডী আর রূপেন কেকেএমপি। আর আমি হলাম ট্রিপল এমডি।"
প্রত্যুষ কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "এসব আবার কীসের ডেজিগনেশন?"
মৃত্যুঞ্জয় এবার খোলসা করে বলল, "কেএমজি হল কোনওমতে গ্র্যাজুয়েট। এইচজি হল হাফ গ্র্যাজুয়েট। সেকেন্ড ইয়ারে বা থার্ড ইয়ারে ব্রেক ফেল করলে আমরা বলি হাফ গ্র্যাজুয়েট। আর কেকেএমপি মানে কেতরে-কুতরে মাধ্যমিক পাশ। আর ট্রিপল এমডি মানে তিনবার মাধ্যমিকে ডিগবাজি।"
প্রত্যুষ হেসে ফেলল। বলল, "নিজেদের নিয়ে হিউমার করার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সুখে-দুঃখে স্বাভাবিক থাকা যায়। একটা কথা জেনে রাখবে পুঁথিগত শিক্ষাই বড় কথা নয়। আসল শিক্ষা মনুষ্যত্ববোধ। আমি শুনেছি তোমরা এখানে নানারকম সামাজিক কাজকর্ম করো। চিরকাল প্রচারের আড়ালে তোমাদের এই কাজকর্ম চলে।"
রূপেন বলল, "যাক বাবা, তবু ভাল। আপনি যে আমাদের একেবারে হেলাফেলা করেননি সেটা আমাদের সৌভাগ্য। শিক্ষকরা তো আবার একটু নাকউঁচু স্বভাবের হয়।"
প্রত্যুষ মৃদু হেসে বলল, "আমি যে ক'টা দিন এ গ্রামে আছি, লক্ষ্য করছি চারদিকে বেশ কিছু ক্ষতিকর প্রভাব আছে। যদি কোনওদিন তোমাদের সাহায্য চাই, পাব কি?"
শ্যামল বলল, "আপনি তা হলে ঠিকই আন্দাজ করেছেন। আসলে ওইসব ক্ষতিকর শক্তির কাছে আমরা কিন্তু কুলোর বাতাস। তা দিয়ে চুরিচামারি, ইভ টিজিং-এর মতো খুচরো সমস্যার মোকাবিলা করা যায়, কিন্তু ক্ষতিকর সমস্যার বড়-বড় থামগুলো বিন্দুমাত্র টলানো যায় না।"
প্রত্যুষ বলল, "মৃদু হাওয়া যখন ঝড় হয়ে ওঠে, শালপাতার মতো অনেক বড় প্রাসাদকেও উড়িয়ে দিতে পারে। আশা করি তোমাদের মধ্যে সেই ঝোড়ো হাওয়া একদিন নিশ্চয়ই দেখতে পাব। আজ তা হলে আসি। সামনের রক্তদান শিবিরের টিফিনের খরচটা কিন্তু আমিই দেব।"

কেএমজি হল কোনওমতে গ্র্যাজুয়েট। এইচজি হল হাফ গ্র্যাজুয়েট। সেকেন্ড ইয়ারে বা থার্ড ইয়ারে ব্রেক ফেল করলে আমরা বলি হাফ গ্র্যাজুয়েট। আর কেকেএমপি মানে কেতরে-কুতরে মাধ্যমিক পাশ।

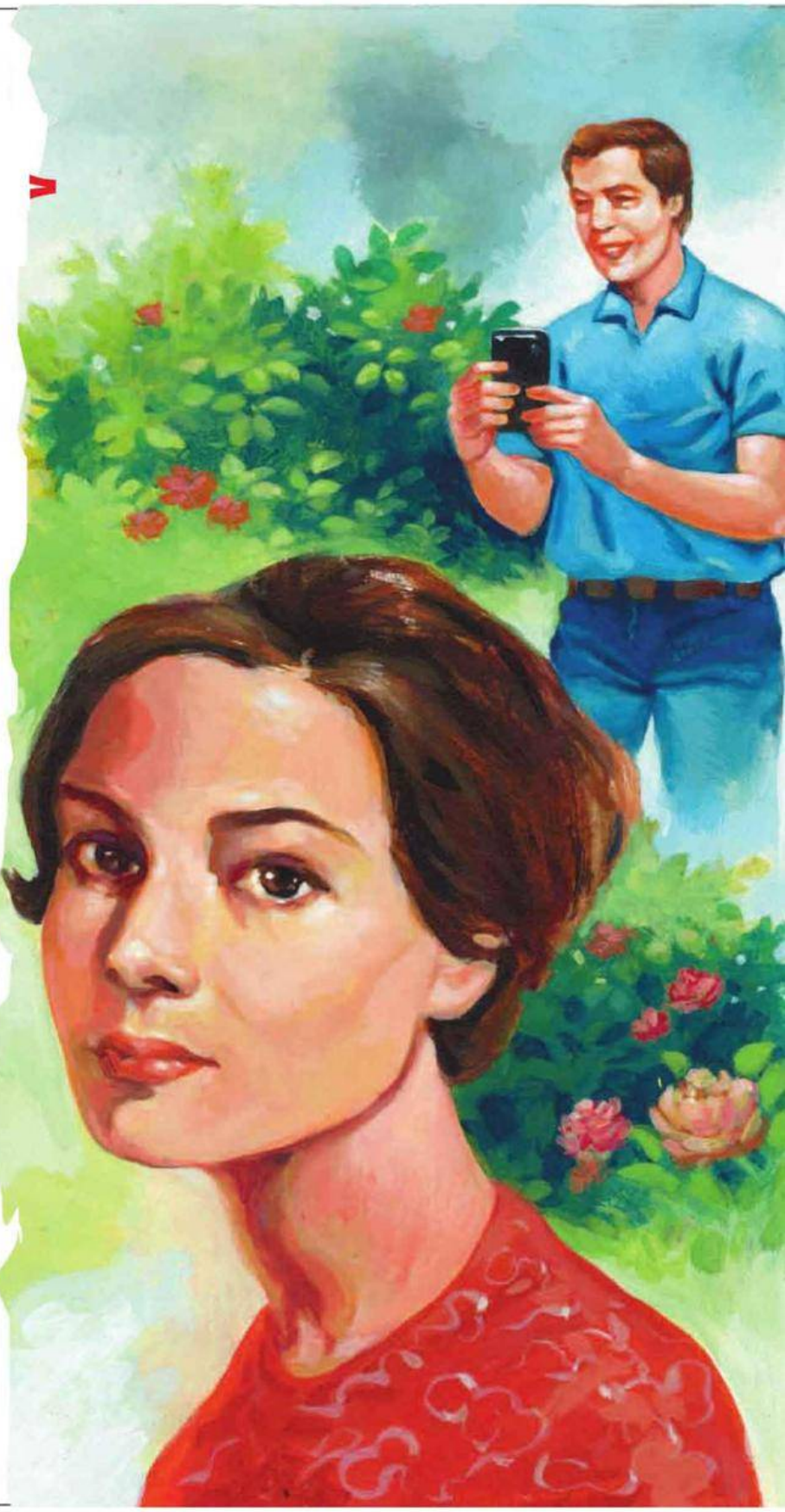

॥ ৭ ॥

প্রত্যুষের স্কুলশিক্ষক জীবনের একমাস পূর্ণ হল। প্রথম যেদিন স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে পা রেখেছিল, মূল গেট দিয়ে ঢুকেই চোখে পড়েছিল উন্মুক্ত সিমেন্টের চাতাল। মাঝখানে স্বামী বিবেকানন্দর বিরাট প্রস্তরমূর্তি। দু'পাশে ফুলের বাগান। অজস্র ফুলের সমারোহ। পুরো স্কুল বিল্ডিংটা নারকেল, ইউক্যালিপটাস আর লেবু গাছে ঘেরা। ছাত্রদের চিৎকার আর পাখির কলরবে স্কুলচত্বর একাকার। ভীষণ ভাল লেগেছিল প্রত্যুষের। তারপর এক-এক করে সহশিক্ষকদের সঙ্গে পরিচয় এবং ছাত্রদের সঙ্গে সখ্য বেড়ে উঠল। সে আগে থেকেই ঠিক করে নিয়েছিল ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশবে। তাদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হবে। ছাত্রদের কোনও সমস্যা থাকলে সে সমাধান করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। গরিব ছাত্রদের পড়াশোনার ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নেবে। তার নিজের মাইনের টাকায় তাদের সাহায্য করবে। আর ছাত্রদের শরীরচর্চা এবং খেলাধুলোর ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। সে প্রথমেই স্কুলের মাঠটার পরিচর্যার ব্যাপারে মন দিল। দিনপনেরো খেলাধুলো বন্ধ রেখে ছাত্রদের নিয়ে মাঠের যাবতীয় ময়লা, নুড়ি, কাঁকর সাফ করার দায়িত্ব নিল। সারা মাঠে দূর্বাঘাস লাগিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করল। পনেরো দিনেই স্কুলমাঠ একেবারে অন্যরকম। মখমলের মত সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ দেখে তাক লেগে যাওয়ার জোগাড়।

প্রধান শিক্ষক মাখনলাল দাস তো বলেই ফেললেন, "এই না হলে গেম টিচার! মর্নিং শোজ দ্য ডে।

খেলাধুলোয় আমাদের স্কুলের তেমন কোনও সুনাম নেই। আশা করি প্রত্যুষ, আপনি আপনার অভিজ্ঞতা দিয়ে সম্ভাবনাময় ছাত্রদের প্রতিভার বিকাশে যথার্থ দায়িত্ব নেবেন। জানেন তো, আমাদের স্কুলে মন্টু মণ্ডল নামে একটা ছেলে দারুণ ছুটত। সে এখন রিকশাভ্যান চালায়। গতবছর থেকে ছেলেটা আর আসে না। ওর কিন্তু দৌড়ে বেশ প্রতিভা ছিল। স্কুল স্পোর্টসে কোনওদিন প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয়নি।"

বিকেলে স্কুল ছুটির পর প্রত্যুষ মন্টুদের বাড়ি গেল। মন্টু তখন বাড়িতে। খবর পেয়ে ভিতর থেকে জ্বর গায়েই উঠে এল। প্রত্যুষের মুখোমুখি হয়ে বলল, "আপনি স্যার! আমাদের বাড়িতে! খবর দিলে আমিই স্কুলে যেতাম।"
"তার মানে?" প্রত্যুষ অবাক হল।
"হস্টেলের বাজার, মুদির দোকানের জিনিসপত্র তো আমিই ভ্যানরিক্শা করে স্কুলে পৌঁছে দিই। আপনার কি স্যার ভ্যানরিক্শা দরকার?"
"আমি ওসবের জন্য আসিনি। আমি এসেছি তোর ভ্যানরিকশা চালানো বন্ধ করতে।"
পাশেই ছিলেন মন্টুর মা। বললেন, "তা কী করে হয় মাস্টারবাবু? এখনও তো ওর ভ্যানরিকশা চালানোর জন্যই আমাদের সংসার চলে।"
প্রত্যুষ বলল, "আমি সব জানি। মন্টুই আমাকে একদিন সব কথা বলেছে। তবে আমি চাই মন্টু আবার লেখাপড়া শুরু করুক। ওর সব ক্ষতিপূরণ আমি মাসে-মাসে মিটিয়ে দেব।"
মন্টু বলল, "আমি আবার স্কুলে পড়ব?"
প্রত্যুষ বলল, "হ্যাঁ, তুই আবার স্কুলে পড়বি। এখন থেকে তোর সব দায়দায়িত্ব আমার। তুই স্কুলে পড়বি আর প্রাণভরে দৌড়বি। তোকে আমাদের স্কুলের সুনাম বাড়াতে হবে। তোকে উসেইন বোল্টের মতো দৌড়তে হবে।"
মন্টু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "উসেইন বোল্ট? সে আবার কে? আমি তো নাট-বল্টুর কথা শুনেছি।"
প্রত্যুষ মৃদু হেসে বলল, "আস্তে-আস্তে সব জানতে পারবি।"

প্রত্যুষ চলে যাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে-শুয়ে মন্টু আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। বন্ধুবান্ধবদের কথা। সেই জীবন কত আনন্দের ছিল। মন্টুদের পরিবার আগে বেশ সচ্ছল ছিল। ওর বাবা বাংলাদেশের বরিশাল থেকে এদেশে এসেছিল ওর জন্মের আগে। সঙ্গে আনা টাকা দিয়ে লক্ষ্মীপুরের দশকাঠা ভিটে কিনে টালির ছাউনির বাড়ি করেছিল। শুধু তাই নয়, পাঁচ বিঘে ফসলি জমিও কিনেছিল। তাতে ধান, গম, পাট, ডাল, সরষে, তিল ছাড়াও মরসুমি আনাজপাতি চাষ হত। মন্টুদের নিজেদের হাল চষার একজোড়া বলদও ছিল। এমনকী দুধেল গাই-গোরুও ছিল। খেয়ে-পরে ভালভাবেই দিন কেটে যেত তাদের। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সব খোয়াতে হয়েছিল। মন্টুর মার ফুসফুসের গন্ডগোল ধরা পড়ার পর অপারেশন করাতে হয়েছিল। সমস্ত ফসলি জমি, গোরু, বলদ বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। সম্পত্তি বলতে এখন শুধুই দু'কাঠা জমির উপর ছোট্ট, একচালা টালির ঘরটাই সম্বল। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো এখন আবার তার বাবা শয্যাশায়ী। মাত্র ক'মাস সংসারের জাঁতাকলে পড়ে হাঁসফাঁস করছিল মন্টু। কিন্তু জ্বর-গায়েও আজ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবার ফিরে পাবে আগের জীবন।
বিছানায় শুয়ে-শুয়ে স্মৃতির ক্যানভাসে ভেসে ওঠে শৈশব শেষের দিনগুলো। শুধু দুষ্টুমির খেলা। নিমতলার মাঠে ঘুড়ি ওড়াতে যাওয়া। উড়ে যাওয়া ভোকাট্টা ঘুড়ির সঙ্গে মাঠঘাট পেরিয়ে ছুটে চলা। কিছুই হুঁশ থাকত না, কোথায় পাকা ধানের জমি, পটলের খেত, বেগুনের খেত কিংবা পানের বরোজ। সবকিছু বাধা পেরিয়ে শুধু ছুট আর ছুট। কখনও বা ঘোষেদের বাগান পেরিয়ে আম-জাম চুরি, সিধু, মনু, রুবেল আর শানুদের নিয়ে কত বাগানের ফল যে পেড়ে খেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এমনকী ওরা শীতের সময় পূর্ণিমা রাতে অদ্ভুত উপায়ে রস চুরি করে খেত। একটা ফুটখানেক পাটকাঠি ভেঙে পেছনে জামার কলারের ভিতরে গুঁজে রাখত। তারপর উঠে যেত খেজুর গাছে। পরে হাঁড়ির মধ্যে পাটকাঠিটা ঢুকিয়ে অপর প্রান্ত দিয়ে চোঁ চোঁ করে টানত। পুরো হাঁড়ির রসটাই পরমানন্দে সাফ করে দিত মন্টুরা। শসা চাষের জন্য ঢোলবাড়ি বিখ্যাত ছিল। মাচায় চাষ করা শসাগুলো যেমন রসালো ছিল, তেমনই সুস্বাদু। মন্টুরা সবচেয়ে বেশি বাধা পেত ঢোলবাড়ির শসা চুরি করতে গিয়ে। যমুনা নদীর পাশেই ঢোলদের বাড়ি এবং শসাবাগান। ঢোলদের কুকুরটা ছিল ভারী বদ। মন্টুদের তাড়া করলে যমুনা নদী পর্যন্ত নিয়ে যেত। যতক্ষণ না মন্টুরা নদীতে লাফিয়ে পড়ত, ততক্ষণ ঘেউঘেউ করত।
যমুনা নদী ছিল মন্টুদের কাছে এক অফুরন্ত আনন্দের আধার। স্নানের সময় বন্ধুরা মিলে সাঁতার দিয়ে হাঁসের পিছনে ছুটত। যমুনার দু'ধারে ঘন ঘাসের বন ছিল। সেখানে বন্ধুরা মিলে আঁতিপাঁতি করে হাঁসের ডিম খুঁজত।
মন্টুর জীবনে যমুনা নদীর প্রভাব সমস্ত শৈশব জুড়ে। এমনকী কৈশোরে পা দিয়েও তার খামতি নেই। দাদু বেঁচে থাকতে তাকে কত গল্প বলত যমুনা নদী নিয়ে। এই যমুনা নদী দিয়ে গোবরডাঙা জমিদার বংশের বড়-বড় বজরা যাতায়াত করত। সে সব বজরার গায়ে অপূর্ব কারুকাজ। জমিদার বংশের বিলাসপ্রিয় বাবুরা বিকেল হলেই বজরা নিয়ে নৌবিহারে বেরোতেন। তখন নানারকম জলযান যমুনার বুকে চলাচল করত। বজরা, কাছারি, বাইচ, ছিপ থেকে শুরু করে মাছ ধরার নানাধরনের নৌকো। মন্টুদেরও একটা ছোট নৌকো ছিল বেলেনীর জমি থেকে ধান, গম, সরষে, তিল এবং পাট আনার জন্য। মন্টুর বন্ধুদের আবার নৌকো, ডোঙা দুটোই ছিল। এক বন্ধুর শালতিও ছিল। শালগাছের গুঁড়ি দিয়ে ডোঙার মত জলযানের নামই শালতি। ডোঙায় চড়তে মন্টুর ভীষণ ভাল লাগত। দাঁড় বেয়ে টানলেই ছোট্ট ডোঙা এগিয়ে যেত সাঁইসাঁই করে। বাবার মুখে শুনেছে যমুনা-সংলগ্ন বিরাট মাঠটায় গোষ্ঠবিহারী মেলা বসার অনেকদিন আগে থেকেই ইয়া বড় নৌকো করে বিশাল আকৃতির সব হাঁড়ি, জালা, কলসি আসত। জোয়ারের সময় চাষিরা বেলেনীর মাঠ থেকে বিশাল-বিশাল পাটের জাগ ভাসিয়ে আনত। ব্যবসায়ীদের বড়-বড় কাঠের গুঁড়ি, বাঁশের তাড়া ভাসিয়ে নেওয়া হত। কখনও বা সাপে-কাটা মৃতদেহকে কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হত। ছোটবেলায় মন্টুর চোখের সামনে কতদিন যমুনা দিয়ে মরা গোরু ভেসে যেত। আর সেই মরা গোরুর ভাগ নিয়ে কুকুর আর শকুনদের মধ্যে সে কী লড়াই!
মন্টুর প্রিয় যমুনা নদী আজ স্রোতহীন। সেদিকে তাকালে আজকাল ভীষণ খারাপ লাগে। যমুনা নদীতে আজকাল আর জোয়ার-ভাঁটা খেলে না।

যমুনা নদী ছিল মন্টুদের কাছে এক অফুরন্ত আনন্দের আধার। স্নানের সময় বন্ধুরা সাঁতার দিয়ে হাঁসের পিছনে ছুটত। যমুনার দু'ধারে ঘন ঘাসের বন ছিল। সেখানে বন্ধুরা মিলে হাঁসের ডিম খুঁজত।

সমস্ত নদীর বুক জুড়ে শুধুই কচুরিপানার দাপট। পলি পড়ে-পড়ে আর নদী সংস্কারের অভাবে যমুনা নদী আজ সত্যি নাকাল। অথচ কে বলবে এই নদীকেই কেন্দ্র করে কুচুলিয়ায় দুশো পরিবারের লোকজন নিয়ে জেলেপাড়া গড়ে উঠেছিল!

যমুনা নদীতে আজ আর মাছ নেই বললেই চলে। আগে যমুনা নদীতে কতরকমের মাছ ছিল। বড়-বড় বোয়াল, শোল, পাঁকাল, আড়, গজাল থেকে শুরু করে পাবদা, ট্যাংরা, বেলে, বাইন, সরপুঁটি, মৌরলা, চিংড়ি, গুলে, আরও কত কী! মন্টুর এখনও স্পষ্ট মনে আছে চোত-বোশেখ মাসে তার দাদু যখন তাকে নিয়ে নৌকোয় করে মাছ ধরতে যেত, তখন যমুনা নদীতে লক্ষ-লক্ষ চিতে কাঁকড়ার ঢল নামত। জলে হাত ডুবিয়ে তুললেই দেখা যেত হাতভর্তি ছোট-ছোট চিতে কাঁকড়া। ওরা কামড়াত না। তবে হাত বেয়ে চলতে শুরু করলে ভীষণ সুড়সুড়ি লাগত। যমুনায় তখন সারে-সারে পাট পচানো হত। সেই পাট পচানো জলেই ওদের আধিপত্য ছিল।

পাঁচবছর আগেও মন্টু জেলেপাড়ার ডানপিটে বন্ধুদের নিয়ে কত মাছ ধরেছে। আড়াআড়ি করে দুটো বিরাট বাঁশে বাঁধা জালের টঙে চড়ে মাছ ধরতে কী যে ভাল লাগত! কখনও বা তেকোনা বাঁশের খুঁচনি জাল দিয়ে কাদা খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে গুলে, চেঙো, কুঁচে, পাঁকাল, বাইন মাছ ধরত। মন্টুর আজও মনে পড়ে বল্লিবিলের শুধিকচ্ছপ ধরার দিনগুলোর কথা। দাদুর সঙ্গে বল্লিবিলের হাঁটুজলে শুধিকচ্ছপ ধরতে যেত। ডোঙার মাঝে সে একা বসে থাকত। তার সামনে থাকত কচ্ছপ রাখার একটা জেয়না। দাদু হাঁটুজলে নেমে একটা বেতের লাঠি জলের মধ্যে ঠুকতে-ঠুকতে এগিয়ে যেত। 'ঠক' করে একটা শব্দ হলেই সেই শব্দ তাক করে জলের মধ্যে দু'হাত ঢুকিয়ে কচ্ছপ ধরে আনত। দাদুর কাছেই শুনেছিল জলের তলায় কচ্ছপরা নাকি সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। সঠিক দিক অনুমান করে দাদু জলের মধ্যে থেকে কচ্ছপের মুখ আর পিছন চেপে তাকে অনায়াসে জল থেকে তুলে আনত। ডাঙার কচ্ছপ কী ভাবে ধরেই উলটে দিতে হয়, সেটাও দাদু তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল।

শুধু মাছ ধরাই নয়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সেতু থেকে যমুনায় লাফিয়ে পড়ার আনন্দটা ছিল শিহরন জাগানো। যমুনার জোয়ারের জলে চিৎসাঁতারে ভেসে যেতে-যেতে বক আর পানকৌড়ি দেখার মজাটাই ছিল একেবারে অন্যরকম।

শৈশব আর কৈশোরের সেইসব সুখের দিনগুলোর কথা ভাবতে-ভাবতে মন্টু একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ৮ ॥

নকপুল থেকে তিনআমতলা পর্যন্ত নতুন এই বাইপাস রুটটা হয়ে বহু লোকের উপকার হয়েছে। আসলে নকপুল থেকে তেঁতুলিয়া যাওয়ার পথে মছলন্দপুর স্টেশন রোডে ব্যাপক ট্র্যাফিক জ্যাম হওয়ার জন্য এই নতুন বাইপাসের জন্ম। চমৎকার পিচঢালা পথ চলে গিয়েছে প্রকৃতির বুক চিরে। রাস্তার দু'পাশে সবুজের সমারোহ। গাছে-গাছে অজস্র পাখি। এদিকটায় এখনও বেশ পাখি দেখা যায়। রাস্তাটা বেশ নির্জন। মাঠে মরসুমি শাকসবজি দেখে মন জুড়িয়ে যায়।

বিকেলের সূর্য যমুনার ওপারে ঢলে গেলে সরোজ আর মনোরঞ্জন বেরিয়ে পড়লেন বৈকালিক ভ্রমণে। দু'জনেই রিটায়ার্ড। সরোজ চক্রবর্তী কলাসিম হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এখন অবসর জীবনে 'যমুনামতী' নামে একটি পত্রিকা চালান। মনোরঞ্জন রায় রেলের চাকুরে ছিলেন। 'যমুনামতী' পত্রিকাতে বর্তমানে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছেন। দু'জনের বাড়িই লক্ষ্মীপুরে। বহুদিনের বন্ধুত্ব। আজ তারা অবশ্য মণিময় সেনগুপ্তর বাড়িতেই যাচ্ছেন। তাঁর একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার নেবেন বলে। 'যমুনামতী' পত্রিকা সামনের মাসে পঁচিশ বছরে পদার্পণ করছে আর তাতে গ্রামের শ্রদ্ধেয় মানুষটির সাক্ষাৎকার থাকবে না, তা কি হয়? সেই সংক্রান্ত কথা বলতে-বলতে হঠাৎ সরোজ চক্রবর্তী বলে উঠলেন, "বুঝলে হে মনোরঞ্জন, অনাচারে দেশটা ভরে গেল।"

"হঠাৎ কী হল তোমার সরোজ? দেশের ভাবনায় কার প্রতি আবার তোমার বিদ্বেষ উথলে উঠল? আমার তো এখন নিজের কথাও ভাবতে ইচ্ছে করে না।"

"কেন?"

"সবসময় মনে হয় মাথার উপর একটা উড়ন্ত হেলিকপ্টার পাক মেরে বেড়াচ্ছে।"

"আজকাল কী সব হেঁয়ালি করো মনোরঞ্জন? তোমার মাথার উপর হেলিকপ্টার পাক খেতে যাবে কেন?"

"খাচ্ছে গো, পাক খাচ্ছে। আর ওই উড়ন্ত হেলিকপ্টারে কে বসে থাকে জানো?"

"কে?"

"কে আবার, যমরাজ। তাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। শেষ নাভিশ্বাসটা ফুড়ুৎ হলেই টপ করে তুলে নেবে। আজকাল তো নিজের চুল পোড়ার গন্ধটাও মাঝে-মাঝে নাকে ভেসে আসে।"

"শুধু সমাজ পোড়ার উগ্র গন্ধটাই তোমার নাকে ঢোকে না। তা না হলে এই বয়সে শুধু প্রেমের উপন্যাস লিখতে না। এই দ্যাখো বলতে না-বলতে সমাজ পোড়ার সিন হাজির," বলেই সরোজ সামনের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

পামেলা একাই আসছিল। পরনে অত্যাধুনিকার সাজ। হলুদ টপ আর কালো মিনিস্কার্ট। যে কোনও যুবকের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার স্পর্ধা তার সারা অঙ্গে। সমস্ত অবয়ব জুড়ে অপ্রতিরোধ্য যৌন আবেদনের মাদকতা। হ্যান্ডিক্যামে পামেলা একমনে রাস্তার পাশের একটা কৃষ্ণচূড়া গাছে বসা পাখির ছবি তুলছিল।

সরোজ বললেন, "মেয়েটাকে কিন্তু এর আগে এ গ্রামে দেখিনি।"

"আমিও। হয়তো কারও বাড়িতে-বিদেশ বিভুঁই থেকে বেড়াতে এসেছে। তা না হলে..."

মনোরঞ্জনের কথা কেড়ে নিয়ে সরোজ বললেন, "তা না হলে কী?"

"স্বর্গের নন্দনকানন থেকে টুপ করে পড়েছে খসি, ষোড়শী উর্বশী।"

"এই বয়সেও তোমার এলেম আছে। ড্রেসটা দেখেছ?"
"এখনও দু'চোখে যখন ছানি পড়েনি, তখন দেখতেই হবে। টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি এবার লাটে উঠল বলে!"
হঠাৎ সরোজ বলে উঠলেন, "এই রে ঘোষপাড়ার সেই বখাটে ছেলেগুলো আসছে। মেয়েটার কপালে দুঃখ আছে। তাড়াতাড়ি পা চালাও মনোরঞ্জন, না হলে আমাদের মান-ইজ্জত থাকবে না।"
কিছুক্ষণের মধ্যে বাইক চেপে আসা ঘোষপাড়ার বখাটে ছেলেগুলো পামেলাকে পথের মাঝে ঘিরে ধরল। তিনটে বাইক থেকে নামল তিন বখাটে। চিকনা, বিল্লু আর রাখু। ওরা সদ্য-নেতা-হওয়া চাঁদু ঘোষালের লোক। এলাকার সেরা ইভটিজারও। ওদের বাধা দেওয়ার কারও হিম্মত নেই। রাজনীতির নোংরা উঠোনকে এখন সবাই ভয় পায়। ওই উঠোনে এখন আর কোনও তুলসীতলা নেই। বিষাক্ত পার্থেনিয়াম ঝোপে বোঝাই।
বাইক থেকে প্রথমে চিকনা নেমে সিটি মারল। তারপর হেঁড়ে গলায় পামেলার দিকে লোলুপ দৃষ্টি হেনে বলল, "আহা ওই খোলা পিঠে, দিচ্ছে ঝিলিক রসের পুলি পিঠে।"
বিল্লুও সুর তুলল, "বল্লে বল্লে রাধা, তোমার ঠোঁটে রাধাবল্লভী, হায় করিশমা, দোষ দিস না, করলে আমায় কী লোভী।"
পামেলা দু'চোখে আগুন ঝরালে রাখু বলে উঠল, "ওরে ও সোনামণির, দু'চোখে নীলিমাতে, মহব্বতের মটর পনির।"
পামেলা তীব্র চিৎকার করে উঠল, "আই সে স্টপ দিস ভালগার ল্যাঙ্গুয়েজ!"
হঠাৎই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পালায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের মতো প্রত্যুষের উদয়। একা নয়, সঙ্গে ইলেভেনের জনাপনেরো ছাত্রও ছিল। প্রত্যুষ ওদের নিয়ে রামকৃষ্ণ পাঠাগার ক্লাবের মাঠে ফুটবল ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল। সবাই সাইকেলে ফিরছিল।
পামেলা ওদের বদমাইশির কথা প্রত্যুষকে বললে, প্রত্যুষ চিকনাদের উদ্দেশে বলল, "তোমরা যাকে টিজ় করছিলে সে কে জান? স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলের সেক্রেটারির আত্মীয়া।"
চিকনা বলল, "আমরা কে সেটা কি জানেন?"
বিল্লু বলল, "আপনি স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলের নতুন স্যার তো?"
"হ্যাঁ।"
"তবে আপনিও জেনে রাখুন, আমরা চাঁদু ঘোষালের ছেলে। সব জায়গায় মাস্টারি করতে আসবেন না।"
এ কথায় প্রত্যুষের সঙ্গে আসা ছাত্ররা বিল্লুদের দিকে তেড়ে যেতে প্রত্যুষ তাদের বাধা দিয়ে বলল, "দেখলে তো, সবাইকে দাবিয়ে রাখা যায় না। তোমাদের ভয়ে বৃদ্ধ, প্রৌঢ়েরা বাজপড়া গাছ হতে পারে, সদ্য যৌবনে পা দেওয়া ছেলেরা কিন্তু নয়। তোমরা কুমির হলে ওরাও কিন্তু কামট হতে পারে। সুতরাং এবার থেকে একটু ভদ্র হওয়ার চেষ্টা করবে। মেয়েদের সম্মান দিতে শিখবে।"
চিকনা বলল, "লে হালুয়া! আপনি কি আবার মাস্টারমশাইয়ের মুখোশ পরে নতুন দল-টল গড়তে চান নাকি?"
"না, দল-টলে আমার বিশ্বাস নেই। আমার বিশ্বাস, ইচ্ছে করলে সবাই মিলে ভালভাবে থাকা যায়। আমি ভিতু নই, তাই তোমাদের এত কথা বলছি। আমার পিছনে গোটা স্কুল আছে। আর গোটা স্কুল যখন আছে, গোটা গ্রামও থাকবে। আমি যেন আর কোনওদিন তোমাদের এভাবে কোনও মেয়েকে অসম্মান করতে না দেখি। তা হলে কিন্তু স্কুলের ছেলেরা এবং গ্রামবাসীরা ছেড়ে কথা বলবে না।"
চিকনারা গজগজ করতে-করতে চলে যাওয়ার পর প্রত্যুষ ছাত্রদেরও যে যার বাড়ি চলে যেতে বলল।

একটা কথা নিশ্চয়ই জানেন যে, মহাভারতের যুগে দ্রৌপদীও তো সারা অঙ্গে কাপড় জড়িয়ে রেখেছিল। পেরেছিল কি দুর্যোধন, দুঃশাসনের লালসার হাত থেকে বাঁচতে? এই তো পুরুষ!

প্রত্যুষকে একা পেয়ে পামেলা বলল, "থ্যাঙ্কস। জানোয়ারগুলোর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু ওদের ভাল কথা শুনিয়ে কোনও লাভ আছে কি? যাদের চোখের দৃষ্টিই নেই, তাদের আয়না দেখিয়ে কী লাভ?"
"ওদের না হয় শুনিয়ে লাভ নেই, আপনাকে কি কিছু কথা বলতে পারি?"
মিষ্টি হেসে পামেলা বলল, "কী কথা?"
"ওদিকে চলুন, তারপর বলছি," ডানদিকে আঙুল দেখিয়ে একটু দূরে যমুনা নদীর পার দেখিয়ে এরপর প্রত্যুষ বলল, "এদিকটায় যমুনা নদী ভারী সুন্দর একটা বাঁক নিয়েছে। বেশ কয়েকটা কদম গাছও আছে। জায়গাটা বেশ নির্জন।"
প্রত্যুষ আর পামেলা একটা ঘাসময় জায়গা বেছে বসল। তারপর পামেলা কিছুক্ষণ হ্যান্ডিক্যামে ছবি তোলার পর বলল, "কই, বললেন না তো কী বলবেন?"
প্রত্যুষ একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "না, বিশেষ কিছু নয়, শুধু একটা রিকোয়েস্ট ছিল। এসব পাড়াগাঁয়ে অতটা বোল্ড ড্রেস না পরাই ভাল।"
ঝটিতি মুখ কুঁচকে পামেলা বলল, "হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বোল্ড ড্রেস? এই ড্রেস পরেই তো আমি নিউ ইয়র্কের পথে হাঁটাচলা করি।"
"এটা কিন্তু নিউ ইয়র্ক নয়, অখ্যাত গ্রাম লক্ষ্মীপুর।"
"ও মাই গড! সে জন্য বুঝি আমাকে এখানে গণেশের কলাবউয়ের মতো শাড়ি পরে বেরোতে হবে?"
"না, মানে..." বলেই প্রত্যুষ ইতস্তত করতে লাগল। পামেলা কিছুটা উত্তেজিত গলায় বলল, "এ যুগের মেয়েরা কী পরবে, সেটাও কি পুরুষদের থেকে জেনে নিতে হবে? আপনি কি মনে করেন যুগ-যুগ ধরে আপনারা মেল শভিনিজ়ম-এর ধ্বজা ওড়াবেন?"
"আমি ঠিক এইসব মনে করে কথাগুলো বলিনি।"
"যাই বলুন না কেন, একটা কথা নিশ্চয়ই জানেন যে, মহাভারতের যুগে দ্রৌপদীও তো সারা অঙ্গে কাপড় জড়িয়ে রেখেছিল। পেরেছিল কি দুর্যোধন, দুঃশাসনের লালসার হাত থেকে বাঁচতে? এই তো পুরুষ!"
"কিন্তু ম্যাডাম, দ্রৌপদীকে সেই লালসার কুনজর থেকে বাঁচিয়েছিলেন যিনি, একজন পুরুষ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।"
"একটু আগে সেই কৃষ্ণের রোলটা পারফর্ম করে আপনি কি এখন আমাকে গোটা গীতাটাই উগরে দিতে চান?"
প্রত্যুষ ভেবে পেল না এরপর কী বলা উচিত। শুধু বিড়বিড় করল, "কী সাংঘাতিক চিজ রে বাবা! একেবারে খাট্টা ইমলি!"
পামেলা বলল, "কিছু বলছেন মনে হয়, এনিথিং হুইস্পারিং?"
"না মানে, ওই দেখুন জমিদার বাড়ির ওদিকে কী প্রচণ্ড কালো মেঘ। চলুন, ওঠা যাক। জোর বৃষ্টি আসবে, সঙ্গে ছাতা-টাতা কিছু নেই। আপনার হ্যান্ডিক্যামে জল ঢুকে গেলে খারাপ হয়ে যাবে। আপনারও নতুন পরিবেশে ভেজা উচিত নয়।"
পামেলা লক্ষ্মী মেয়ের মতো উঠে পড়ল। প্রত্যুষ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। যা ঝড় উঠেছিল, বৃষ্টির আগাম বার্তায় শেষ।

॥ ৯ ॥

মহীতোষবাবুদের বাড়ির পিছনের দিকে আমবাগানের বিশাল চত্বরটা অনেকটা শান্তিনিকেতনের মতো। সবুজে ভরা শান্তিময় পরিবেশ। মহীতোষবাবুদের এই আমবাগানের নির্জন পরিবেশটা প্রত্যুষের খুব ভাল লাগে। তাই তো মহীতোষবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় 'কলকাকলি' অনাথ আশ্রমের ছোট-ছোট শিশুদের ব্রতচারী শেখাতে প্রত্যুষ এ জায়গাটাই বেছে নিয়েছে।

মহীতোষবাবুদের বাড়ির একতলার সব জায়গাটাই 'কলকাকলি' অনাথ আশ্রমের জন্য নিবেদিত। সর্বসাকুল্যে বত্রিশজন অনাথ শিশু থাকে। আশপাশের গ্রাম জুড়ে এইসব অনাথ শিশুদের জোগাড় করেছেন মহীতোষবাবু। ছোটবেলা থেকেই তাঁর গাছ লাগানোর অভ্যেস ছিল। মহীতোষবাবু এ অভ্যেসটা রপ্ত করেছেন তাঁর উদ্ভিদপ্রেমিক বাবার কাছ থেকে। তাঁর বাবা বলতেন, "এ পৃথিবীতে কোনও গাছ, এমনকী ঝোপঝাড়ও অদরকারি নয়। তাদেরও প্রকৃতির রাজ্যে গুরুত্ব আছে, প্রয়োজন আছে। পথের পাশে ভেরেন্ডা, কালকাসুন্দে, তেলাকুচো, জার্মানি লতা, বুনো পুঁইলতারও দাম আছে। কারণ ওরাও বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নেয়। সেদিন স্কুলের বনমহোৎসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে মহীতোষবাবুর ভাষণ প্রত্যুষের ভীষণ ভাল লেগেছিল। একটা ছোট্ট হিসেব পেশ করে মহীতোষবাবু সেদিন বলেছিলেন, "এ কথা প্রত্যেকেরই জেনে রাখা ভাল যে, পঞ্চাশ টন ওজনের একটা গাছ তার সমগ্র জীবনকালে সমগ্র জীবকুলকে পনেরো লক্ষ টাকার পরিষেবা দেয়।" দু' বিঘা জমি নিয়ে মহীতোষবাবুর একটা গাছের নার্সারিও আছে। তার অদ্ভুত অভ্যেসটা হল প্রতিদিন সকালে সাইকেলে হোমিওপ্যাথিক বাক্স নিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে গ্রামে ঘুরে-ঘুরে চিকিৎসা করা, আর ক্যারিয়ারে বয়ে নিয়ে যাওয়া বিভিন্ন চারাগাছ এখানে সেখানে রোপণ করা। তার এই অভ্যেসের কোনওদিন ব্যতিক্রম হয়নি।

ছোট-ছোট অনাথ শিশুরা আজ বেজায় খুশি। প্রত্যুষস্যার আজ তাদের ব্রতচারী শেখাবে। তাদের সবার পরনে ব্রতচারীর জন্য বিশেষভাবে তৈরি নতুন পোশাক। ওরা গোল হয়ে হাত ধরাধরি করে দাঁড়াল।

প্রত্যুষ বলতে শুরু করল, "আমার সঙ্গে তোমরা সবাই একসঙ্গে বলো, জ্ঞানব্রত অনুসরণ, শ্রমব্রত অনুসরণ, সত্যব্রত অনুসরণ, ঐক্যব্রত অনুসরণ এবং আনন্দব্রত অনুসরণ।"

ওরা সমস্বরে পঞ্চব্রত আওড়াল।

বেশ কিছুক্ষণ ছন্দনাচ শেখানোর পর প্রত্যুষ বলল, "বারোটা পণের কথা কিন্তু সবসময় মনে রাখবে," বলেই সুর করে প্রত্যুষ বলতে লাগল।

"ছুটব খেলব হাসব
ভাল লাগে না। শেখানোর কত কিছু আছে! প্রাণায়াম, সংকল্প, প্রার্থনা, বাউল নাচের গান, সারি নৃত্যের গান, ঝুমুর নৃত্যের গান, কাঠি নাচের গান। ওদের ব্রতচারী শেখানোর ফাঁকে প্রত্যুষ তার অতিপ্রিয় নৃত্যগীত স্মরণ করে গুনগুনিয়ে উঠল।

"চল কোদাল চালাই, ভুলে মনের বালাই
ঝেড়ে অলস মেজাজ হবে শরীর ঝালাই।
শত ব্যাধির বালাই বলবে পালাই পালাই
পেটে খিদের জ্বালায় খাব ক্ষীর আর মালাই।"

রাত্রিবেলা খাওয়ার সময় তরুবালা কথাটা পাড়লেন। প্রত্যুষকে বাহবা জানিয়ে বললেন, "অনেকদিন পর যেন আবার ছোটবেলাটা ফিরে পেলাম। জানো তো আজ আমবাগানের সুরেলা বাতাস যখন আমার কানে এসে ঝাপটা মারছিল, তখন আমিও ছোটবেলায় শেখা গানটা গুনগুন করে গাইছিলাম, 'ব্রতচারী হয়ে দেখো জীবনে কী মজা ভাই, হয়নি ব্রতচারী যে, সে আহা কী বেচারিটাই।' "

প্রত্যুষ বলল, "আপনার এখনও মনে আছে ব্রতচারীর নৃত্যগীত!"

তরুবালা মৃদু হেসে বললেন, "ছোটবেলায় কতবার যে গেয়েছি, এত সহজে ভোলা যায়? একটু শুনলেই যেন সবটা মনে পড়ে যায়।"

রাতে শুয়ে-শুয়ে প্রত্যুষের আজ ছোটবেলার কথাই বারবার মনে পড়ছে। প্রত্যুষ ছিল মায়ের ভীষণ ন্যাওটা। কিছুতেই পিছু ছাড়ার পাত্র নয়। ঠিক যেমন বাড়ির মালিকের পায়ে পোষা বিড়াল ঘুরঘুর করে। মনে পড়ে একবার দক্ষিণেশ্বরে মা যখন পুজো দিচ্ছিল, ছোট্ট প্রত্যুষ বিশাল মন্দির প্রাঙ্গণে ঘুরঘুর করছিল। অনেকবার এভাবেই মন্দির প্রাঙ্গণে তাকে ছেড়ে দিয়ে তার মা পুজো দিয়ে আসত। কিন্তু সেবার প্রত্যুষ গেল হারিয়ে। চার বছরের প্রত্যুষ টুকটুক করে এগিয়ে গিয়েছিল চাতাল ছেড়ে গঙ্গার পাড়ের দিকে। সিঁড়ি বেয়ে নামছিল। আর ঠিক তখনই পিছন থেকে ছুটে এসে তাকে কোলে নিয়ে মায়ের সে কী কান্না! সেই মাকে ফেলে রেখে আজ সে জীবিকার খাতিরে লক্ষ্মীপুরে। প্রত্যুষের বুকের ভিতরটা কেমন ডুকরে উঠল। মার মুখটা কতদিন স্বচক্ষে দেখেনি। শুধু মোবাইলে সেভ করা মায়ের ছবিটাই সম্বল। প্রত্যুষ ভেবেই নিল সামনের সপ্তাহে একবার বাড়ি ঘুরে আসবে।

॥ ১০ ॥

মেদিয়ার বাঁওড়ের পুবদিকের এই গাছগাছালিময় জায়গাটা পিকনিক স্পটের জন্য আদর্শ। এই জায়গাটা আগে যমুনা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এখন গোটা মেদিয়াই জলবেষ্টিত একটা দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত, শুধু একদিকে স্থলভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। আগে মেদিয়া কয়েকঘর লোকের বাসভূমি ছিল। এখন প্রায় শ'দুয়েক পরিবার। তবে পূর্বদিকটা সত্যি মনোরম। এদিকটায় জনবসতি নেই। বিশেষ দিনে লোকেরা এখানে এসে পিকনিক করে। পনেরোই অগস্ট তো গোটা বাঁওড় জুড়ে হুইল, ছিপ দিয়ে মাছ ধরার জন্য মানুষের ঢল নামে। সে এক চমৎকার দৃশ্য। সেদিন মেদিয়ার বাঁওড় জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। টিকিট কেটে কয়েকশো লোক মাছ ধরে সেদিন। তবে অন্যান্য দিন বেশ নির্জন থাকে বাঁওড়টা। গয়েশপুরের কয়েকজন জেলে মিলে বাঁওড়টা লিজ নিয়েছে। ওরাই বাঁওড়টা দেখাশোনা করে।

মৌপিয়াকে নিয়ে প্রত্যুষ আজ পিকনিক স্পটের সন্ধানে এসেছে। মৌপিয়ার সঙ্গে প্রত্যুষের সম্পর্ক এখন অনেক সহজ। মৌচাক ভাঙার দিনই সম্পর্কটা অনেক সহজ হয়ে এসেছিল। মৌপিয়াই ফোন করে ডেকেছিল প্রত্যুষকে মৌচাক ভাঙা দেখানোর জন্য। প্রত্যুষ যে প্রথম দিন তাদের বাড়ি এসে

মৌচাক ভাঙা দেখতে চেয়েছিল, সে কথা মৌপিয়ার ঠিক মনে ছিল। সেদিন মৌচাক ভাঙতে বেড়গুম থেকে দু'জন লোক এসেছিল। সেই প্রথম প্রত্যুষ জেনেছিল মৌচাকের মৌমাছি তাড়াতে প্রচুর ধোঁয়ার প্রয়োজন হয়। প্রত্যুষ আর মৌপিয়া দাঁড়িয়ে ছিল ছাদে। কী করে যেন সাত-আটটা মৌমাছি তাদের দিকে ধেয়ে আসছিল। প্রত্যুষ অ্যাথলিট-সুলভ দ্রুততায় মৌপিয়াকে আড়াল করে ওই ঝাঁকটার হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল। সবক'টা মৌমাছির কামড় একা সহ্য করেছিল। ঘরে গিয়ে মৌপিয়া প্রত্যুষের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। প্রথমে পেঁয়াজের রস, তারপর সরষের তেল-হলুদের গুঁড়ো। তবুও প্রচণ্ড ব্যথা যাচ্ছিল না। শেষে মৌপিয়া নিজের চুল দিয়ে ঘষে-ঘষে হুলগুলো বের করার পর ব্যথাটা একটু কমেছিল। সে রাত্রে ব্যথার জন্য হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়ার পরেও প্রত্যুষের শরীর জুড়ে এল ধুম জ্বর। ক'টা দিন আফসোস করতে-করতে মন দিয়ে প্রত্যুষের সেবা করেছিল মৌপিয়া। কারণ সে-ই প্রত্যুষকে ডেকে এনেছিল মৌচাক ভাঙা দেখার জন্য। সম্পর্কের নিবিড়তার সেই ছিল শুরু। তারপর হঠাৎই একটা মাইল্ড স্ট্রোকে মণিময়বাবুর বাঁদিকটা প্রায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস প্রত্যুষ ফিজিওথেরাপি শিখেছিল। সেই কারণে সপ্তাহে তিনদিন মৌপিয়াদের বাড়ি আসতে হত। প্রত্যুষ মাসাজ করত আর সেই ফাঁকে শুনত মণিময়বাবুদের স্বাধীনতাসংগ্রামের দিনগুলোর কথা। মণিময়বাবুর স্ত্রী সুধাময়ীদেবী পেটে অ্যাপেনডিসাইটিসের যন্ত্রণা নিয়েও বিপ্লবীদের জন্য ঢেঁকিতে চিঁড়ে কুটতেন। মৌপিয়া এই বাড়ির মেয়ে বলেই এতটা পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীল।

ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারিয়েছিল বলে মৌপিয়া যা-যা চেয়েছিল, সব শিখতে দিয়েছেন মণিময়বাবু। শুধু আদরের নাতনি হয়ে নয়, মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচতে শিখুক মৌপিয়া, সেই ইচ্ছেটাই বরাবর মনে পোষণ করেছিলেন মণিময়বাবু।

মৌপিয়া নাচ-গান-ছবি আঁকা সব শিখেছে। এখন তার শিক্ষাগুলোই সে বাচ্চাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায়। সেই কারণে তাদের বাড়িতে আসা বাচ্চাগুলোকে যেমন নাচ-গান-আঁকার মধ্যে বড় করে তুলছে, মহীতোষবাবুর প্রতিষ্ঠিত 'কলকাকলি'-র সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে মৌপিয়া।

মৌপিয়ার একান্ত ইচ্ছে তার প্রয়াত ঠাকুমার নামে তাদের বাড়িতে একটা শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করার। তার নাম হবে 'সুধাময়ী চিলড্রেন এডুকেশন সেন্টার।' এ ব্যাপারে প্রত্যুষও কথা দিয়েছে তাকে সবরকমভাবে সাহায্য করবে। তারও বহুদিনের স্বপ্ন তার নিজের মনের মতো করে একটা নার্সারি স্কুল গড়ে তোলার, যেখানে শিশুদের আরও সহজ করে শিক্ষা দেওয়া হবে। একই সঙ্গে থাকবে মজা, আনন্দ আর শিক্ষা। এর সঙ্গে সে শিশুদের জন্য একটা যোগ সেন্টারও খুলতে চায়।

একটা ব্যাপারে প্রত্যুষ আর মৌপিয়ার মানসিকতার দারুণ মিল। দু'জনেই প্রচণ্ড শিশুপ্রেমী। মৌপিয়া বলে, "শিশুরা যতদিন দুঃখকষ্টের ভিতর থাকবে ততদিন পৃথিবীতে প্রকৃত ভালবাসা বলতে কিছু নেই। যে শিশুদের ভালবাসতে পারে না, সে কাউকেই ভালবাসতে পারে না।"

মৌপিয়ার ঘরে একটা অদ্ভুত ছবি আছে। ছবিটা তারই আঁকা। একটা প্রকাণ্ড সূর্যের মধ্যে নানা দেবদেবীর হাসিমুখের ছবি। আর তার চারপাশে কেন্দ্র করে ঘোরা গ্রহগুলোর মধ্যে ছোট ছোট শিশুদের মুখ। ছবিটার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে মৌপিয়া বলেছিল, "সূর্যের কাছাকাছি যেমন মহাকাশের এই গ্রহগুলো থাকে, তেমনই ঈশ্বরের সবচেয়ে কাছে থাকে শিশুরাই।" শুনে প্রত্যুষের মন ভরে গিয়েছিল।

প্রত্যুষ আর মৌপিয়া ঘুরতে-ঘুরতে এগিয়ে চলল বাঁওড়ের দিকে। একেবারে বাঁওড়ের জল ছোঁওয়া দূরত্বে দাঁড়িয়ে মৌপিয়া হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলল, "দ্যাখো, কী সুন্দর পদ্মগুলো ফুটে রয়েছে।"

প্রত্যুষ একটু ঝুঁকে একটা পদ্মর নাগাল পেল। সেটা ছিঁড়ে মৌপিয়ার হাতে দিতেই খুশিতে তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর একটু এগোতেই মৌপিয়ার আবার উচ্ছাস! বলল, "দ্যাখো, দ্যাখো! কী সুন্দর শাপলাফুল ফুটে রয়েছে। আর তার চারপাশে মাছগুলো কিলবিল করছে। আমার না এখন ওই মাছগুলো ভীষণ ধরতে ইচ্ছা করছে।"

প্রত্যুষ সঙ্গে কিছু শুকনো মুড়ি এনেছিল মাছদের খাওয়াবে বলে। মুড়িগুলো ফেলতেই মাছগুলো খলবলিয়ে উঠল। মৌপিয়া খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, "আমি আজ রাতেই বাড়ি গিয়ে এই ছবিটা আঁকব। জলে মাছদের মুড়ি খাওয়ার দৃশ্য এত সুন্দর!"

প্রত্যুষ একটা তালগাছের সামনে এসে মৌপিয়াকে বলল, "ওগুলো কী গো? কী সুন্দর বানানো! যেন নিখুঁতভাবে তৈরি করা শুকনো ঘাসের ঘট ঝুলছে। একটা দুটো নয়, অজস্র। গাছময়।"

প্রত্যুষের কথায় মৌপিয়া হেসে আকুল হয়ে বলল, "ওগুলো ঘট নয় মশাই, বাবুই পাখির বাসা।"

"বাবুই পাখির বাসা! এত সুন্দর! পড়েছি বটে। কিন্তু স্বচক্ষে এই প্রথম দেখলাম।"

মৌপিয়া বলল, "ওই বাসার মধ্যে বাবুইপাখিরা গোবর লেপ্টে সন্ধ্যায় জোনাকিপোকা ঠেসে দেয়। রাত্রে জোনাকি পোকার আলোয় ওদের ঘরটা আলো হয়।"

প্রত্যুষ মোবাইল দিয়ে বাবুইপাখির বাসার ফোটো তুলতে লাগল।

ঠিক সেই সময় সামনে একটা আমগাছের ডালে লেজঝোলা হলুদ পাখিকে আরও কাছে গিয়ে দেখতে গিয়ে মৌপিয়া থমকে গেল। হঠাৎ একটা ডালে একটা হনুমান এসে ঝাঁপিয়ে পড়লে মৌপিয়া সভয়ে পিছন ফিরে দৌড়ে এসে কাঁপতে-কাঁপতে প্রত্যুষকে জড়িয়ে ধরল।

জীবনে এই প্রথম বুক তোলপাড় করা শিহরনে প্রত্যুষ যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। কোনও নারীর উষ্ণ আলিঙ্গনে এই প্রথম প্রত্যুষ ধরা পড়ল। মাখন-কোমল শরীরের স্পর্শে এত উত্তেজনা!

কতক্ষণ ওরা আলিঙ্গনাবদ্ধ ছিল সে খেয়াল মৌপিয়ার ছিল না। প্রত্যুষ "হনুমানটা চলে গিয়েছে," বলার পর মৌপিয়ার সম্বিত ফিরল। একটু পরে মৌপিয়া বলল, "এখানে পিকনিক করা যাবে না।"

"কেন, হনুমানের জন্য?"

"না। ভেবে দেখলাম, শিশুদের পিকনিকের জায়গায় জলাশয় থাকা ভাল নয়।"

পিকনিক হোক বা না হোক, প্রত্যুষের জীবনে এ জায়গাটা চিরজীবনের জন্য স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে রইল।

কলেজ-জীবনেও সে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, কিন্তু এত লাবণ্যময়ী নয়। আসলে মেয়েটা যত না সুন্দরী, তার চেয়ে অনেক বেশি লাবণ্যময়ী। মেয়েটার গায়ের রং খুব ফরসা নয়, তবে চাপাও নয়।

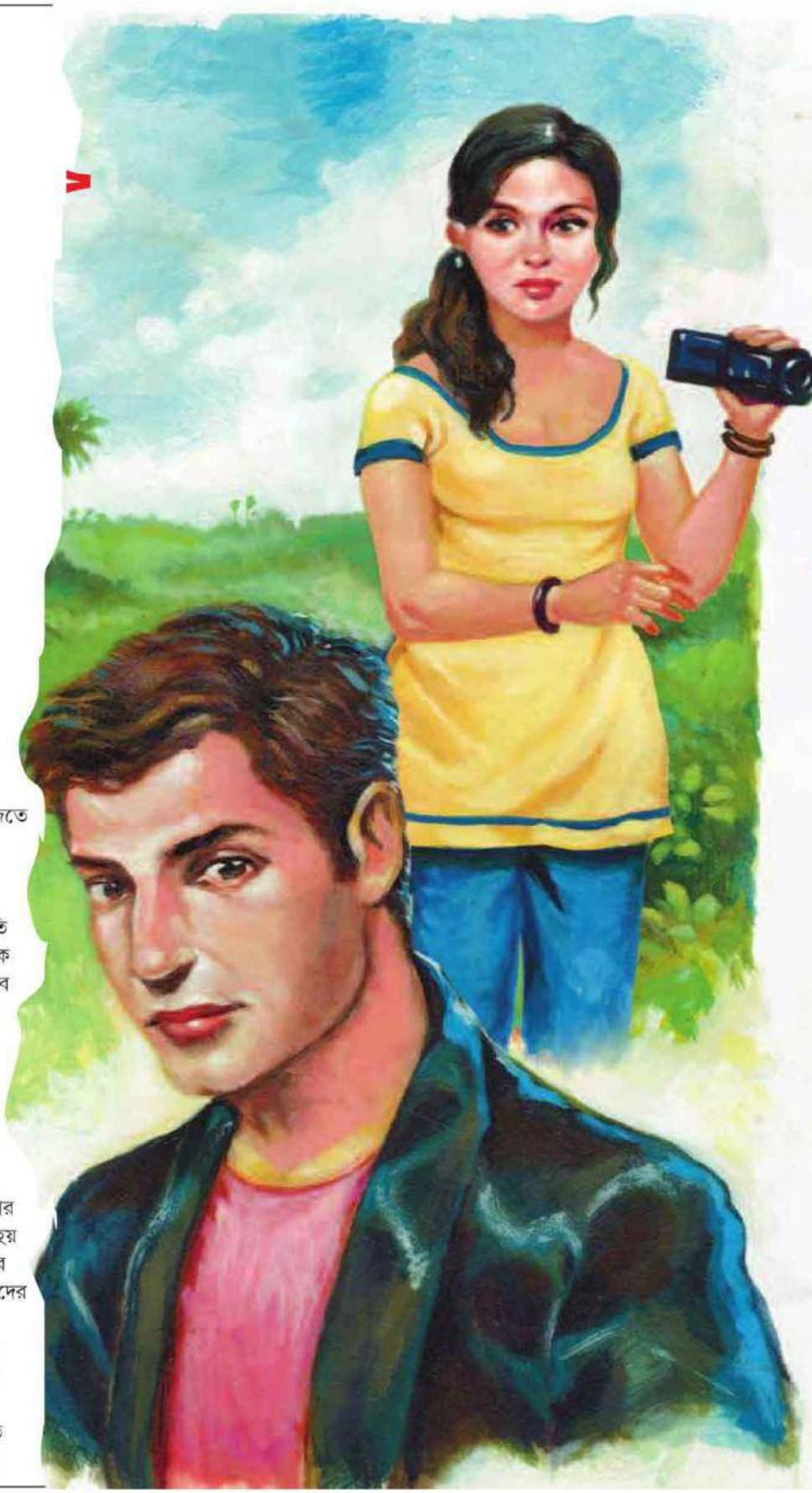

॥ ১১ ॥

আজ কাকভোরে প্রত্যুষ ঘুম থেকে উঠেছে। 'কলকাকলি'-র সব শিশুরা তখনও ঘুমে অচেতন। প্রত্যুষ অভ্যেসমতো টুথব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দাঁত মাজতে উঠে গেল দোতলার ছাদে। তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। প্রত্যুষের হঠাৎ গতরাতের ফোনে বলা বাবার কথাগুলো মনে পড়ল, "আর যাই করো, আগামী ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতিতে যেন কোনও ঘাটতি না থাকে। আমার রিটায়ারমেন্টের আগে যেন তোমাকে একজন আইএএস বা ডব্লিউবিসিএস অফিসার হিসেবে দেখতে পারি। আমি যেন সবাইকে বলতে পারি যে, আমার ছেলে একজন উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার।" বাবার এই আকাঙ্ক্ষাটাই প্রত্যুষের জীবনে এখন সবচেয়ে বড় বাধা। অন্তত পক্ষে পরীক্ষাদুটো তো দিতেই হবে। অথচ এখানকার এই অবাধ শান্তির পরিবেশে প্রত্যুষ দিব্যি মানিয়ে নিয়েছিল। দু'মাসও হয়নি, এর মধ্যেই প্রত্যুষ স্কুলের ছেলেদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্যার হয়ে উঠেছে। ওরা এখন প্রত্যুষস্যার বলতে অজ্ঞান। প্রত্যুষের কোনও কথার ওরা অবাধ্য হয় না। ওদের বিশ্বাস, প্রত্যুষস্যারের জন্যই একদিন ওদের স্কুল স্পোর্টসে জেলার সেরা হবে। প্রত্যুষ যেভাবে তাদের নিয়ে খাটছে, তার কোনও তুলনা হয় না। ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন থেকে অ্যাথলেটিক্স সব বিভাগেই বাছাই করা ছাত্রদের নিয়ে প্রত্যুষের কোচিং দেখে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরাও মুগ্ধ।

বাবার কথা, বাড়ির কথা, স্কুলের কথা ভাবতে-ভাবতে প্রত্যুষের চোখের সামনে ভোরের আলো ফুটে উঠল।

দোতলার ছাদের এই উত্তর দিকটা প্রত্যূষের ভীষণ পছন্দের জায়গা। সামনের যমুনা নদীও আজ কচুরিপানামুক্ত। দীর্ঘ দু'মাসের সরকারি প্রচেষ্টায় কচুরিপানা সরানো হয়েছে। একেবারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রচুর শ্রমিক নিয়োগ করে যমুনা নদীকে পলিমুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যূষ বুকভরে শ্বাসগ্রহণ করল। বিটি রোডের সেই ধুলো, ধোঁয়া, কার্বন ডাই-অক্সাইড ভরা দূষিত বাতাস আর এখানকার নদীর জল ছুঁয়ে যাওয়া অক্সিজেন-সমৃদ্ধ শীতল বাতাসের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

প্রত্যূষ কিছুক্ষণের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নিল। এক্ষুনি যমুনা নদীর পাড়ে জমিদার বাড়ির বিশাল মাঠে নন্তু, মন্টু, কচি, দুখে, লখারা দৌড় প্র্যাকটিসের জন্য এসে পড়বে। সবাই একসময় স্কুলছুট ছিল। অথচ দৌড়ে ছিল দুরন্ত। প্রত্যূষ কুড়িয়ে পাওয়া হিরের কুচিগুলোকে আবার এক জায়গায় জড়ো করেছে। এদের মধ্যে থেকে অন্ততপক্ষে একজনকে সে জেলার মধ্যে সেরা খুদে রানার তৈরি করবে। মোট আটজনকে প্রত্যূষ বেছে নিয়েছে। দৌড়ে এদের স্পেশ্যাল ট্রেনিং দেবে। এদের মধ্যে তিনজন নিয়মিত ছাত্র। পাঁচজন স্কুলছুট। অবশ্য পাঁচজনকে প্রত্যূষ আবার স্কুলে ভর্তি করিয়েছে প্রধানশিক্ষকের অনুমতি নিয়ে।

স্কুলের নিয়মিত তিনজন হল প্রল্লিম, দীপ আর সায়ন। এদের মধ্যে প্রল্লিম ক্লাস নাইনে পড়ে, দীপ ক্লাস সেভেনে আর সায়ন ক্লাস সিক্সে। নন্তু, দুখে, লখা আগে অন্য স্কুলে পড়ত। মজাদার ঘটনায় নন্তু, দুখে, লখা আর কচিকে আবিষ্কার করেছিল প্রত্যূষ। লখাকে দেখতে পেয়েছিল নিমতলায়। লখার পিছনে লাঠি হাতে তখন তার ক্রুদ্ধ বাবা তাড়া করছিলেন। আর লখাও প্রাণপণে দৌড়াচ্ছিল। সে কী দৌড়! নন্তুকে দেখেছিল কুচুলিয়ায়। একটা মোটরবাইকের পিছনে ছুটতে। দুখেকে দেখেছিল বেড়গুমে ষাঁড়ে তাড়া খাওয়া অবস্থায় পালাতে। আর কচিকে আবিষ্কার করেছিল যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল কলোনিতে। অনেকটা দৌড়ে একটা মুরগি ধরার সময়। অবশ্য এদের মধ্যে ব্যতিক্রম মন্টু। ওর মধ্যে জন্মগত দ্রুততা আছে বটে। কী অপূর্ব স্টেপিং! দৌড়োনোর সময় অঙ্গসঞ্চালনও একজন শিক্ষিত অ্যাথলিটের মতো। আর দমও অফুরন্ত। প্রত্যূষ মনে-মনে মন্টুকেই বাজি ধরে রেখেছে।

মন্টুরা আজ অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশিই প্র্যাকটিস করেছে। আর মাত্র একমাস বাকি আছে ইন্টারস্কুল অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের। তাই প্র্যাকটিসের মাত্রাটাও বেড়েছে। আর শুধু সবুজ ঘাসে ভরা মাঠেই ওরা ওদের প্র্যাকটিস সীমাবদ্ধ রাখেনি। ওদের সার্বিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্র্যাকটিসেও বৈচিত্র এনেছে প্রত্যূষ। কখনও মছলন্দপুর রেলস্টেশনের ওভারব্রিজের সিঁড়ির ধাপ দৌড়ে পেরনো, কখনও বেড়গুমের টিলা বেয়ে উপরে ওঠা, কখনও নুড়িপাথরের রাস্তায় বা ফসলকাটা মাঠের এবড়ো-খেবড়ো প্রান্তরের উপর দিয়ে ছোটা, কখনও বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়েও ওদের ছুটতে হয়। বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছোটার পর প্রথম দিন তো প্রল্লিম প্রশ্ন করেই ফেলল প্রত্যূষকে, ''আচ্ছা স্যার, এভাবে বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটে কী লাভ? ম্যারাথন রেসেও তো বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটতে হয় না।''

প্রত্যূষ বলেছিল, ''এটা আমার এক ধরনের দৌড়বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলতে পারিস। জানিস তো, বিদেশে দৌড়ের সময় যন্ত্রসঙ্গীত বাজানো হয় যাতে গতির ছন্দকে সঙ্গীতের তালের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায়। আধুনিক ক্রীড়াবিজ্ঞানীরাও বলেন, সঙ্গীতের তাল নাকি শরীরের ছন্দে একাত্ম করে দিতে পারলে শরীরের সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়। এই বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছোটার সময় কান দুটো সজাগ রাখলেই শুনতে পাবি হরেকরকমের পাখির ছন্দোবদ্ধ ডাক। সেই ছন্দে পা মিলিয়ে ছুটলেই ছোটার সব ক্লান্তি মিলিয়ে যাবে। জানিস তো, বিশ্ববিখ্যাত দৌড়বীর মাইকেল জনসন বৃষ্টির মধ্যেও অনুশীলন করতেন শুধুমাত্র বৃষ্টির ছন্দ শুনে দৌড়নোর জন্য।''

আজ প্র্যাকটিস শেষে অন্যান্য দিনের মতো মন্টুরা গোল হয়ে বসল। মাঝখানে প্রত্যূষ। এ সময়টা প্রত্যূষ কোচিংয়ের কোনও কথা বলে না। ভোকাল টনিক দিয়ে সবাইকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করে। কখনও বিখ্যাত দৌড়বীরদের জীবনসংগ্রামের কাহিনি শোনায়। কিন্তু আজ কথা বলার ফাঁকে লক্ষ করে মন্টু কেমন মনমরা ভঙ্গিতে বসে রয়েছে। তাই মন্টুকে বলল, "কী ব্যাপার রে মন্টু, তুই আজ প্রথম থেকেই কেমন যেন মনমরা। কী হয়েছে রে তোর?"

মন্টু বলল, "আমি মনে হয় আর দৌড়তে পারব না।"

"কেন? কী এমন হল যে, তোকে একেবারে দৌড় ছেড়ে দিতে হবে?"

"বাবার অসুখটা যে কিছুতেই সারছে না। এখন আবার বাবার হাঁটতে পায়ে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। বাবা হাঁটতে পারছে না, আমি দৌড়ে বেড়াচ্ছি। তা কি হয়?"

"তুই থামবি?" হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠল প্রত্যূষ। পরক্ষণে বলল, "তোকে অত ভাবতে হবে না। আমি আছি কী করতে! আমি তোর বাবাকে ভাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। একটা কথা তোদের সবাইকে বলছি, মন দিয়ে শুনে রাখ। সমস্যা যেমন আসে তেমন আবার চলেও যায়। তার জন্য ভেঙে পড়া উচিত নয়। আমাদের জীবনটা সংগ্রামের জন্য। জীবনের যে কোনও সমস্যাকে মনে করবি চলার পথে হঠাৎ চোখে পোকা ঢুকে যাওয়ার মতো। যখন পোকাটা চোখ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন সাময়িক জ্বলুনিটা উধাও হয়ে যায়। চোখের সামনের পৃথিবীটাও আগের মতো আবার আলোকময় লাগে। কারও যদি কোনও সমস্যা থাকে তবে সেটা তোরা আগে আমাকে বলবি। আমি তো আছি। তোদের কোনও ভয় নেই।"

নন্তু বলল, "খেলাধুলোটা তো এখন বড়লোকদের। আমাদের মতো গরিবেরা কি বেশিদিন খেলাধুলা চালিয়ে যেতে পারবে?"

প্রত্যূষ বলল, "কেন পারবি না? জানিস আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ দৌড়বীর জেম্‌স ক্লিভল্যান্ড ওয়েসের ছেলেবেলা কেটেছে চরম দারিদ্রে। চেকোশ্লোভাকিয়ার 'চেক এক্সপ্রেস' নামে স্বনামধন্য দৌড়বীর এমিল জেটোপেকও অতিদরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন। ওঁরা যদি দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে দৌড়তে পারেন, তোরা কেন পারবি না? আসলে সবচেয়ে বড় কথা হল, নিজের মনটাকে নিয়ন্ত্রণে আনা। তোরাও চেষ্টা করলে আমাদের দেশের মিলখা সিংহ, রাম সিংহ, পি টি উষার মতো দৌড়তে পারবি। দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারবি।"

ছন্দকে সঙ্গীতের তালের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায়। ক্রীড়াবিজ্ঞানীরাও বলেন, সঙ্গীতের তাল নাকি শরীরের ছন্দে একাত্ম করে দিতে পারলে শরীরের সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়।

প্রল্লিমরা এসব কথা শুনে মনে-মনে উদ্দীপ্ত হয়। আজ প্রত্যূষস্যার আছে বলেই তো তারা বিশ্ববিখ্যাত সব দৌড়বীরদের নাম জানে। প্রত্যূষস্যার খবরের কাগজ আর বিভিন্ন ম্যাগাজিন দেখিয়ে চিনিয়ে দিয়েছে কে ফ্লাই ফিন পাভো নুরভি, কার্ল লুইস কিংবা মাইকেল জনসন। ওদের এখন

উসেইন বোল্টের নামও মুখস্থ। সামনের ইন্টারস্কুল অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে প্রত্যুষস্যারের জন্য তারা জান লড়িয়ে দেবে।

॥ ১২ ॥

দুঃসংবাদ দাবানলের আগে ছোটে। তাই পাঁচকান হয়ে এমন ভয়াবহ ঘটনাটা প্রত্যুষের কানে যেতে বেশি সময় লাগেনি। স্কুল যাওয়ার জন্য তোড়জোড় করছিল প্রত্যুষ। ঘনঘন অ্যাম্বুলেন্সের শব্দে আগেই মন কু ডাকছিল। এত ঘনঘন অ্যাম্বুলেন্স যাতায়াত করছে কেন? একটু আগেই শেষবারের মতো নিউজ় চ্যানেলগুলো সার্ফ করে দেখছিল। কোথাও কোনও ট্রেন বা বাস দুর্ঘটনার খবর নেই। এখানে ধারেকাছে এমন কোনও হাইরাইজ় ফ্ল্যাটবাড়ি নেই যে ভেঙে পড়বে। শেষে মহীতোষবাবুর বাড়ি থেকে আসা ঠিকে ঝি অলকাই সংবাদটা দিল।

ধর্মপুরের চোলাই কারখানার মদ খেয়ে আশপাশের অঞ্চলের প্রায় দুশো জন মানুষ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। হিন্দু মিলন মন্দিরের ছেলেরাই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে অসুস্থদের গোবরডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার কাজে কোমর বেঁধে লেগেছে। শ্যামল, বিল্টু, নারান, চণ্ডী, মৃত্যুঞ্জয়রা অক্লান্তভাবে ছোটাছুটি করছে। মহাবিপদে এদের মতো ছেলেরাই ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রত্যুষ মনে মনে তাদের হ্যাট্স অফ করল।

স্কুলে গিয়ে আজ প্রত্যুষ কিছুতেই মন বসাতে পারল না। টিফিনেই শুনল চরম দুঃসংবাদটা। বারোজন লোক ইতিমধ্যে হাসপাতালেই মারা গিয়েছে। তার মধ্যে দু'জন তার পরিচিত। একজন ক্লাস টেনের তারেক আলির বাবা নাসিমুদ্দিন। নাসিমুদ্দিন দিনে করাতকলে কাজ করে। রাতে রিকশাভ্যান চালায় যতক্ষণ না শেষ ট্রেন গোবরডাঙা স্টেশন ছাড়ে। আর-একজন স্কুলের মিড ডে মিলের রাঁধুনি কুসুমের স্বামী। কুসুমের স্বামী নগেন ঘুরে-ঘুরে ঘুগনি বিক্রি করে।

এমন দুঃসংবাদে টিফিনেই স্কুল ছুটি হয়ে যায়। উঁচু ক্লাসের ছেলেরা একান্তে প্রত্যুষকে ডেকে বলল, "আমরা আর চুপ করে থাকতে পারব না। আজকেই আমরা ধর্মপুরে গিয়ে চোলাই কারখানা ভাঙব।"

ইলেভেনের তরুণ বলল, "স্যার, যেখানে রাজনৈতিক নেতারা কিছু বলছেন না, গ্রামের মান্যগণ্যরাও প্রতিবাদহীন, পুলিশরা সব পুতুল, কলেজের দাদারাও উদাসীন, সেখানে আমরা আর চুপ করে থাকব না। আমরা আজই চোলাই কারখানা ভাঙব। দেখি আমাদের কে আটকায়! আমাদের কুসুম মাসি স্বামীহারা হয়েছে, তারেক পিতৃহীন হয়েছে। আমরা কিছুতেই চোলাই কারখানা থাকতে দেব না।"

মুহূর্তের মধ্যে শ'খানেক ছাত্র গিয়ে প্রত্যুষের তত্ত্বাবধানে ধর্মপুরের চোলাই কারখানা ভেঙে তছনছ করে দিল। অবশ্য ওদের দেখে স্থানীয় গ্রামবাসীরাও এগিয়ে এসেছিল। তারাও এতদিন ক্ষোভে ফুটছিল কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারছিল না। কারণ একজন রাজনৈতিক নেতার মদত ছিল এই ভাটিখানা চালু রাখার পিছনে। আর যেখানে রাজনীতির নোংরামি, সেখানে সাধারণ মানুষ কিছুতেই প্রবেশ করতে চায় না। সমাজটা উচ্ছন্নে গেলেও যেন তাদের হুঁশ নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে স্থানীয় থানার ওসি এল। তখনও ভাঙচুর চলছে। ওসি প্রত্যুষের কাছে এসে বলল, "খবর পেয়েই ছুটে আসতে হল। শুনলাম আপনার নেতৃত্বেই নাকি এসব ভাঙচুর হয়েছে। আপনি একজন লেখাপড়া-জানা শিক্ষক মানুষ। এত জানেন, কিন্তু এটা জানেন না যে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া ঠিক নয়? এ তো শিক্ষকসমাজের লজ্জা!'

প্রত্যুষ মৃদু হাসল। তারপর বলল, "এতদিন যেটা আপনাদের করা উচিত ছিল, সেটা ছাত্ররা করে দিল। লজ্জাটা তো আপনাদের পাওয়া উচিত।"

ঘিরে-ধরা মানুষের ভিড়ে বুমেরাংটা হজম করে ওসি বললেন, "যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে, এখন তাড়াতাড়ি ছাত্রদের নিয়ে চলে যান। মিডিয়ার লোক এল বলে। আর ওরা এলেই দুনিয়ার হাজার প্রশ্ন। এখন ভালয়-ভালয় চলে যান।"

॥ ১৩ ॥

আজ ধর্মঘট। স্থানীয় এলাকা জুড়ে বারো ঘণ্টার ধর্মঘট ডেকেছে একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল। প্রকাশ্যে মারামারির কারণে একটি দলের দু'জন রাজনৈতিক কর্মী মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে যুঝছে। কেউ বলছে বিরোধী দলের লোকেরাই এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। কেউ বলছে ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে উপদলের বাড়বাড়ন্তই এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ।

পামেলার এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। ওর ঠোঁটের হাসিতে রাজনীতির প্রতি বিদ্রুপ মাখানো। রাজনীতি একটা কুয়াশা ভরা খাদ ছাড়া আর কিছু না। কোথায় যেন পড়েছিল 'পলিটিক্স ইজ় এ গেম অফ স্কাউন্ড্রেল্স।'

এই ধর্মঘটের ফলেই আজ তার শুয়ে-বসে দিন কাটছে না। শেষে বিছানা ছেড়ে উঠেই পড়ল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। আর কাঁহাতক ঘরে থাকা যায়। এতক্ষণ বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় প্রত্যুষের কালেকশন থেকে নেওয়া শিশুবিষয়ক একটা বই পড়ছিল। স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর। তাতে পাতায়-পাতায় লাল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করা। প্রত্যুষ যে কতটা তীক্ষ্ণধী পাঠক, তা তার বই খুললে বোঝা যায়। এক জায়গায় আন্ডারলাইন করা ছিল দুর্দান্ত একটা কোটেশন, "দ্য ডেসটিনি অফ দ্য হোল ওয়র্ল্ড ডিপেন্ডস অন দ্য লিট্‌ল চিলড্রেন। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি দ্য সিলভার লাইনিং অন দ্য হরাইজ়ন, ইট ইজ় নট ইউ অ্যান্ড মি, বাট চিলড্রেন হু হ্যাভ টু বি স্পিরিচুয়ালাইজ়ড।"

প্রত্যুষ যে শিশুদের নিয়ে রীতিমতো পড়াশোনা করে তার কথাবার্তাতেই বোঝা যায়। গতকাল বলেছিল, "জানো তো, আমার একটু উত্তরপ্রদেশে যাওয়ার ইচ্ছে আছে, নিজের চোখে একটা জিনিস দেখতে।"

পামেলা বলেছিল, "কী এমন জিনিস যা দেখার জন্য আপনি উত্তরপ্রদেশ যেতে চান? আগ্রার তাজমহল দেখতে, নাকি তীর্থদর্শন করতে অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, বারাণসী যেতে চান?"

প্রত্যুষ হেসে বলেছিল, "এর কোনওখানেই নয়। আমি যেতে চাই চুড়িনগরী ফিরোজাবাদে।'

"ওখানে কেন যেতে চান? ফিয়াঁসের জন্য চুড়ি কিনবেন?"

"না। কেমন করে চুড়ি তৈরি করে, সেটা দেখতে।"

"চুড়ি তৈরি দেখতে! আশ্চর্য!"

"আশ্চর্যই বটে। জানেন, ফিরোজাবাদে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিশু কাচের চুড়ি বানিয়ে চলেছে। সেই কারখানায় আগুনের চুল্লির তাপমাত্রা ৭০০-৮০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।"

পামেলা আঁতকে উঠেছিল "হরিব্‌ল" বলে। প্রত্যুষের সঙ্গে যত মিশছে ততই পামেলার বিস্ময়ের ঘোর বাড়ছে। প্রত্যুষ সত্যিই চাইল্ডলাভার, অনেস্ট, এনার্জেটিক এবং অবশ্যই আউটস্পোকেন। আর স্পষ্টবাদিতার জন্য তার সঙ্গে পামেলার লাগেও কম না। গত রবিবারই ওরা আটঘরা গিয়েছিল বেদে-বেদেনিদের আস্তানায়। কীভাবে বাচ্চাগুলোও সাপ নিয়ে খেলা করে সেটা দেখতে। আটঘরার দূরত্ব মসলন্দপুর থেকে মাত্র আধঘণ্টার বাস জার্নি। বাস থেকে নেমে ওরা মেঠোপথ ধরে যাচ্ছিল বেদে-বেদেনিদের আস্তানার দিকে। পথের মাঝে পামেলা সিগারেট ধরাতেই প্রত্যুষ বলেছিল, "এটা কি আপনি ছাড়তে পারেন না?"

"কোনটা?"

"সিগারেটটা।"

"কেন?"

"আমাদের দেশের কালচার মেয়েদের সিগারেট খাওয়াটাকে এখনও মেনে নিতে পারে না।"
"জন্মটাই আমার এদেশে। আমার মধ্যের আমিত্বটা কিন্তু বেড়ে উঠেছে বিদেশেই। সুতরাং আমার ক্ষেত্রে ফরেন কালচারটাই বেশি অ্যাডপ্টেবল," প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ঝরে পড়ছিল পামেলার কথায়।
"পেয়ারাগাছের ছাল তুলে সে জায়গায় আমগাছের ছাল জুড়ে দিলেই কি পেয়ারাগাছ আমগাছ হয়ে যায়?"
"আপনি ঠিক কী বলতে চান বলুন তো?"
"আমাদের সমাজ বলে... "
প্রত্যুষের কথার মাঝে কুপিত কথার কোপ দিয়ে বসল পামেলা। বলল, "এই তো ঘুরে-ফিরে ঠিক পুরুষতন্ত্রের পোশাক পরে ফেলছেন!"
"মানে?" প্রত্যুষ কিছুটা বিব্রত হল।
"বোঝার দরকারও নেই। শুধু বলতে চাই সবসময় পুরুষরাই স্বৈরতন্ত্রের ঘোড়ায় চাপবে লাগাম হাতে, এটা যুগ-যুগ ধরে হতে পারে না। আচ্ছা, আপনারা পুরুষরা কি চিরকাল মনে করেন নারীজাতি মানেই রান্না করা, কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, মুড়ি ভাজা, বড়ি দেওয়ার হোম ফ্যাক্টরি?"
"না আমি ঠিক ওভাবে বলতে চাইনি। মানে, ভারতীয় নারীদের..."
প্রত্যুষের আত্মপক্ষ সমর্থনের কথার মাঝপথে আবার ছেদ ঘটাল পামেলা, "থাক। আপনাদের কনসেপ্টে ভারতীয় নারীদের যা কিছু সতীত্ব, মাহাত্ম্য তা তো সীতার এপিসোডেই শেষ।"
"সীতার জীবনের দুঃখ, বঞ্চনার কথা কিন্তু পুরুষকবিই বলে গিয়েছেন।"
"এদেশে নারীত্বের গোটা মানচিত্রই শুধু 'এটা কোরো না, ওটা কোরো না'-র আউটলাইনে বন্দি।"
"কীরকম?"
"রকমের কী আর শেষ আছে? এই অত্যাধুনিক যুগেও এদেশে মেয়েদের পুজো করতে দেওয়া হয় না, কন্যাদান করতে দেওয়া হয় না, মুখাগ্নি করতে দেওয়া হয় না, তর্পণ করতে দেওয়া হয় না।"
"বাপ রে! আপনি তো দেখছি এদেশের শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অনেক কিছু খোঁজখবর রাখেন।"
"সোশিওলজি নিয়ে যখন পড়াশোনা করেছি, তখন কিছু খবর তো রাখতেই হয়।"
"যতই যা বলুন, পুরুষদের বিরুদ্ধে আপনার কিন্তু খুব রাগ।" প্রত্যুষ হাসল।
"রাগ হবে না কেন? চিরকাল কি আপনারাই রাজত্ব করবেন নাকি? মেয়েরা এখন কোন কাজটা না পারে? অলিম্পিক গেমসের খেলাগুলো কি দেখেন? দেখলেই বুঝতে পারতেন মেয়েরা কতটা অ্যাডভান্সড হয়েছে।"
প্রত্যুষও এবার ছাড়ার পাত্র নয়। বলল, "তাই নাকি? আচ্ছা বলুন তো ক'টা মেয়ে দেশরক্ষার জন্য সেনাবিভাগে আছে? ক'টা মেয়ে বনজঙ্গলে সামরিক পোশাক পরে উগ্রপন্থীদমনে নেমেছে? ক'টা মেয়ে কুলিদের মতো টন-টন মাল বইতে পারে, ফাইটার প্লেন বা সাবমেরিন চালাতে পারে?"
পামেলাও হার মানার পাত্রী নয়। বলল, "মেয়েদের বায়োলজিক্যাল ডেফিসিয়েন্সি আছে বলে এসব কাজে অদক্ষ। শুধু ইন্টেলেকচুয়াল ফিল্ডে রেট অফ গ্রোথে কিন্তু মেয়েরাই এগিয়ে আছে।"
"সেটা না হয় মানলাম। কিন্তু আপনার স্মোকিং কোন ফিল্ডের কথা বলছে? পারবেন এসব দিয়ে পুরুষের পুরুষকারকে ছুঁতে?"
"তবে কি মনুসংহিতার মেনু মেনেই চলতে হবে?"
"মনুসংহিতায় কোথাও লেখা নেই মেয়েরা সিগারেট খেতে পারবে না। তা ছাড়া আমি মনুসংহিতায় বিশ্বাসী নই। আমি শুধু বিশ্বাস করি নারীত্বের মাধুর্য তার কোমলতায়।"
পামেলা ঠোঁট উলটে বলল, "হ্যাঁ, সেই আপসহীন কোমলতার আবার কত রূপ! তা না হলে আজও বোরখা বিক্রি হবে কেন! হিন্দু বিধবারা একাদশী করবে কেন!"
প্রত্যুষ এবার রণে ভঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা করল। পামেলার মাথা আজ সত্যিই গরম। যেন রংয়ের গুদামে ফাটা গ্যাস সিলিন্ডার। তাই যথাসম্ভব নিচুস্বরে বলল, "আমরা কিন্তু প্রসঙ্গের বাইরে চলে এসেছি। এখনও বলছি, আমার শুধু আপনার স্মোকিংয়ে আপত্তি আছে।"
"কেন?"
"মাতৃত্বের কথা ভেবে। স্মোকিং বিফোর অ্যান্ড আফটার প্রেগন্যান্সি নিউবর্ন বেবির পক্ষে ভীষণ হার্মফুল।"
"শিট!" বলে পামেলা সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিল।
"এ কী! ফেলে দিলেন কেন?"
পামেলা গম্ভীর গলায় বলল, "বেবির জন্য।"
সেসব কথা ভাবতেই পামেলা এবার ফিক করে নিজের মনে হেসে ফেলল। না, এবার রেডি হতে হবে। গ্রামবাংলার ধর্মঘটের বিকেলটা কেমন তা একটু ঘুরে-ফিরে দেখতে হবে।

॥ ১৪ ॥

আজ রবিবার। এখন রবিবার মানেই প্রত্যুষের কাছে সৃষ্টির দিন, চেতনার দিন। এক নতুন দিশা তার জীবনে যোগ হয়েছে। সে ব্যাপারে পথপ্রদর্শক মহীতোষবাবু। তাঁর সান্নিধ্যই তাকে শিখিয়েছে গাছকে নিবিড়ভাবে ভালবাসতে। একান্ত নির্জনতায় গাছের সঙ্গে কথা বলতে। মহীতোষবাবু একদিন প্রত্যুষকে একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন। সেসময় স্কুলের ভূগোলশিক্ষক ললিতবাবুর সঙ্গে প্রত্যুষের একটা সংঘাত চলছিল। আসলে ললিতবাবু স্কুলে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু সেই জনপ্রিয়তা খুইয়ে প্রত্যুষের প্রতি কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। প্রত্যুষের প্রতিটি উদ্যোগে বাগড়া দিচ্ছিলেন। এমনকী প্রধানশিক্ষক ও সহশিক্ষকদের কাছে প্রত্যুষের নামে লাগানি-ভাঙানি করতেন। প্রত্যুষ যখন তিতিবিরক্ত হয়ে মহীতোষবাবুর কাছে স্কুল ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলেছিল, তখন মহীতোষবাবু বলেছিলেন, "একটু বাইরে যাবে?"
"কেন?" বিস্মিত হয়ে বলেছিল প্রত্যুষ।
"আহা চলোই না," বলে টর্চ জ্বালিয়ে প্রত্যুষকে তাঁর প্রিয় ফুলের বাগানে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আলো নিভিয়ে বলেছিলেন, "এখন কী দেখতে পাচ্ছ?"
"কেন, অন্ধকার?"
"এই অন্ধকারে এখন কি কাজ করা সম্ভব?"
"অন্ধকারে কোনও কাজ করা যায় নাকি?"
"যায়। অবশ্যই যায়," বলেই মহীতোষবাবু এক-একটা গাছের উপর

পৃথিবীর প্রায় সব সুঘ্রাণযুক্ত গাছেরা রাতের ঘন অন্ধকারে ফুল ফোটাতে ভালবাসে। তা হলে মানুষ কেন পারবে না অন্ধকার কাটিয়ে স্বপ্নপূরণ করতে?

টর্চের আলো ফেলতে লাগলেন। আর বলতে থাকলেন, "এটা টগর। ওটা শিউলি। এটা জুঁই, ওটা রজনীগন্ধা। পৃথিবীর প্রায় সব সুঘ্রাণযুক্ত গাছেরা রাতের ঘন অন্ধকারে ফুল ফোটাতে ভালবাসে। তা হলে মানুষ কেন পারবে না অন্ধকার কাটিয়ে স্বপ্নপূরণ করতে?" প্রত্যুষ মহীতোষবাবুর সেই কথায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।

মহীতোষবাবুর কথাগুলোই সে ছাত্রদের শেখায়। বলে, "গাছকে ভালবাসো। এই গাছই একদিন তোমার সঙ্গে কথা বলবে। তোমার দুঃখের ভাগীদার হবে।" পরীক্ষায় ভাল ফল করলে ছাত্রদের দামি গাছ উপহার দেয়। অভিভাবকদেরও বলে, "গাছ লাগান। মনের প্রসারতা বাড়ান আর পরিবেশদূষণ কমান।"

প্রত্যুষের উদ্যোগে স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলের পুরো চত্বরটাই এখন গাছময়। প্রচুর নতুন গাছ তার উদ্যোগেই লাগানো হয়েছে। একদিকে দেবদারু, স্বর্ণচাঁপা, কাঠালিচাঁপা, রঙ্গন, কৃষ্ণচূড়া, মেহগনি, শিমুল, পলাশ। অন্যদিকে ফুলের বাগানে রকমারি ফুলের গাছ।

আজকাল রবিবার এলেই প্রত্যুষের মন খুশিতে উপচে ওঠে। মাসের প্রত্যেকটা রবিবার সকাল অথবা বিকেল কাটে বনসৃজনে। কখনও বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্ররা, কখনও আবার 'কলকাকলি'র অনাথ শিশুরা পালা করে প্রত্যুষের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। প্রত্যেকের হাতেই থাকে চারাগাছ।

রবিবারের বনসৃজনের অভিযানকে আরও বেশি আকর্ষক করে তুলতে পথে যেতে-যেতে কুইজের আয়োজন থাকে। এই বুদ্ধিটা অবশ্য মহীতোষবাবুর। তিনি বলেছিলেন, "গাছ-সংক্রান্ত কুইজের আয়োজন করেও গাছের প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ বাড়ানো যায়," এর জন্য নিজের সংগৃহীত গাছ-বিষয়ক বইগুলো প্রত্যুষকে পড়তে দিয়েছিলেন তিনি।

আজ খাঁটুরার চকদিঘির পাড়ে গাছ লাগাতে চলেছে প্রত্যুষ। সঙ্গে একাদশ শ্রেণির বাছাই করা ২০ জন ছাত্র। পথে যেতে-যেতে শান্তনু বলল, "স্যার আজ কুইজ হবে না?"

প্রত্যুষ বলল, "ঠিক আছে। বলো তো, আকবরের দরবারে বিখ্যাত গায়ক তানসেনের যে সমাধি গোয়ালিয়রে আছে, তার উপর কোন গাছ আছে? শোনা যায় সেই গাছের পাতা খেলে গায়কদের কণ্ঠস্বর মধুর হয়।"

ভোলা বলল, "স্যার, আখ গাছ। কারণ শুধু আখ গাছই মিষ্টি।"

প্রত্যুষ বলল, "জানতাম পারবি না। উত্তরটা হল তেঁতুল গাছ।"

সন্তু বলল, "আচ্ছা স্যার, সেগুন গাছে কি সত্যিই পোকামাকড় ধরে না?"

"হ্যাঁ। কারণ এই কাঠের রজন পোকামাকড়ের কাছে খুব তেতো লাগে। তাই ওরা সেগুন গাছের ছায়া মাড়ায় না।"

দীপঙ্কর বলল, "আচ্ছা স্যার, তানসেনের সমাধিতে তেঁতুল গাছ ছাড়া অন্য গাছ নেই?"

"না। ওটা তেঁতুল গাছের জন্যই।"

"কেন স্যার?"

"তেঁতুল গাছের পাতার অম্লের জন্য। আচ্ছা বলো তো, তসর পোকা কোন গাছের পাতা খেতে ভালবাসে?"

সবাই এর-ওর দিকে তাকিয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলে প্রত্যুষ বলল, "বাংলা বাদাম।"

মুহূর্তে কেষ্ট বলে উঠল, "আমারও স্যার বাদাম খেতে ভীষণ ভাল লাগে। আমি তো বাদামপাতাও পেলে খেতে পারি।"

প্রত্যুষ বলল, "তা হলে তুই নির্ঘাত গতজন্মে তসর পোকা ছিলি!" কথাটা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

চকদিঘিতে পৌঁছতে না পৌঁছতে প্রত্যুষের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। কিছুক্ষণ ফোনে কথা বলার পর সে ছাত্রদের বলল, "না রে, আজ পুরো প্রোগ্রামটাই ভেস্তে গেল। এক্ষুনি খবর পেলাম মাঝপথে চারাগাছভর্তি ট্রাক উলটে গিয়েছে।"

প্রত্যুষ কী করবে ভাবতে না ভাবতে হঠাৎ নজর গেল চকদিঘির পূর্বপাড়ে। ওখানে তখন চকদিঘি সংস্কারের কাজ চলছিল। পুরুষ-মহিলাদের সঙ্গে একঝাঁক বাচ্চা ছেলেরাও কাজ করে চলেছে। একজন শক্তসমর্থ পুরুষ যে পরিমাণ মাটি-মাথায় ঝুড়ি করে বইতে পারে, ঠিক সেই পরিমাণ মাটি এক-একটা বাচ্চা ছেলে ঝুড়ি করে মাথায় নিয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যুষ প্রকল্পের তত্ত্বাবধানরত সুপারভাইজারের কাছে গিয়ে বলল, "ছিঃ! আপনার লজ্জা করে না! এতগুলো বাচ্চাকে শিশুশ্রমিক হিসেবে খাটাচ্ছেন। আপনার পরিবারের বাচ্চাদের দিয়ে করাতে পারবেন? ছেলেগুলো নিশ্চয়ই স্কুলছুট।"

সুপারভাইজার বললেন, "হ্যাঁ, স্কুলছুট না হলে একশো দিন প্রকল্পের কাজ করবে কীভাবে?"

প্রত্যুষ বলল, "কিন্তু ওদের কি এই প্রকল্পে কাজ করার জব অর্ডার আছে? সরকার পারল ওদের জব কার্ড দিতে?"

সুপারভাইজার বললেন, "না, ওদের জব কার্ড নেই।"

"তা হলে ওরা সরকারি প্রকল্পে কাজ করছে কীভাবে?" ক্রুদ্ধস্বরে বলল প্রত্যুষ।

সুপারভাইজার তখন ইতস্তত করে বললেন, "আসলে ওরা কেউ বাবা, দাদা বা দাদুর বদলে কাজ করছে।"

প্রত্যুষ বলল, "ওরা যে ওদের দাদু, বাবা বা দাদার বদলে কাজ করছে তার কি কোনও প্রমাণ আছে?"

সুপারভাইজার "না" বলার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ একটা তীব্র আওয়াজ উঠল। প্রত্যুষ কাছে গিয়ে দেখল একটা তেরো-চোদ্দো বছরের বাচ্চা ছেলে মাটির উপর অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে। মাথার মাটিবোঝাই ঝুড়িটাও একটু দূরে ছিটকে পড়েছে। প্রত্যুষ তাড়াতাড়ি কয়েকজন ছাত্রের সহায়তায় ছেলেটাকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছল। সুপারভাইজারও মুখচুন করে তাদের সঙ্গে গেল।

রাতে টিভির সবক'টা বাংলা নিউজ চ্যানেলের খবরে ছেলেটার মৃত্যুসংবাদ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল প্রত্যুষ। যথারীতি মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়ে চাপানউতোর। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি বারাসাত হাসপাতালে পাঠানো হলেও সাংবাদিকদের বিশ্বাস, ঘাড়ের শিরা ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে। অথচ সুপারভাইজারের বয়ান অনুযায়ী, ছেলেটি প্রকল্পের কাজ দেখার জন্য পাড় থেকে ঝুঁকতেই উলটে পড়ে গিয়ে এই বিপত্তি। ছেলেটার বাবার বয়ান অনুযায়ী, উনি নাকি তার কার্ডটা এন্ট্রি করাতে দিয়েছিলেন ছেলের হাতে। এমনিতেই শরীর দুর্বল ছিল, হয়তো হৃদ্‌রোগে মারা গিয়েছে। নিশ্চয়ই বিপুল পরিমাণে টাকা খাওয়ানো হয়েছিল।

প্রত্যুষ মনে-মনে শপথ নিল, যে করেই হোক আশপাশের অঞ্চল থেকে শিশুশ্রমিকদের মুক্ত করবেই।

॥ ১৫ ॥

সকাল থেকে মৌপিয়ার ব্যস্ততা দেখে মণিময় ভেবে কূল পায় না, ব্যাপারটা কী? অবশ্য ব্যস্ততা শুধু আজই নয়। গত একসপ্তাহ ধরেই বাড়িময় হুলস্থুল চলছে যেন। প্রথমে তো সারা বাগান পরিষ্কার করা। বাঁশের বেড়া দিয়ে মণিময়ের বাড়ির চারপাশ ঘেরা। বেড়ার পাতাবাহারি গাছগুলোকে ভাল করে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। পুরো বাড়িটাই নতুন করে রং করা হয়েছে। এগুলো সব লোক লাগিয়েই করানো হয়েছে, মৌপিয়ার তত্ত্বাবধানে। জানালা-দরজার পরদাগুলোও নতুন কেনা হয়েছে। এমনকি টেবিলক্লথ, আলমারি ও টিভির কভারও নতুন কেনা হয়েছে। ঘরময় কেমন যেন সাজো-সাজো রব। গতপরশু মৌপিয়া বৈঠকখানার জন্য একটা সোফা-কাম-বেড এবং চারটে ফাইবারের চেয়ারও কিনেছে। মণিময় শুধু একবার বলেছিল, "কী ব্যাপার দিদিভাই? কীসের জন্য এতসব আয়োজন? এখন তো কোনও পুজো-পার্বণ বা অনুষ্ঠান নেই।

শুধু-শুধু ব্যাঙ্কের টাকা খরচ করে লাভ কী? ভুলে যেয়ো না, তোমার বাবা তোমার নামে তোমার ছোটবেলায় টাকাগুলো রেখেছিল। তোমার বিয়ের কথাটা একটু মাথায় রেখো। আমার হাতে তো স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশনের টাকাগুলো ছাড়া আর কিছু নেই। আমি এখন শুধু তোমার বিয়ের কথাই ভাবি।"

"তুমি থামবে!" বলে মৌপিয়া শুধু কপট শাসনের ধমক দিয়েছিল। মণিময়ের এখন একমাত্র চিন্তা মৌপিয়াকে নিয়েই। এত ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে! মাধ্যমিকে দ্বিতীয় এবং উচ্চমাধ্যমিকে চতুর্থ হয়েও উচ্চশিক্ষার জন্য লালায়িত হয়নি শুধুমাত্র তাঁর কথা ভেবে। সাহিত্য ভালবাসে বলে বাংলা নিয়ে এমএ পাশ করে ঘরে বসে রয়েছে। কিছুতেই তাঁকে ছেড়ে দূরে কোথাও চাকরি করতে যাবে না। শুধু আশপাশের কোনও স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি পেলে করতে পারে। স্বপ্ন দেখে নিজের প্রচেষ্টায় বাড়িতে একটা নার্সারি স্কুল গড়ার। বাচ্চাদের যে কী ভালবাসে!

আজ সকাল আটটায় প্রত্যুষকে আসতে দেখে মণিময় এবার বেশ আশ্চর্য হলেন। প্রত্যুষ তো এত সকালে কোনওদিন তাদের বাড়িতে আসে না। প্রত্যুষের পিছন-পিছনই রাধাগোবিন্দ ডেকরেটর্সের লোকজন এসে হাজির। পিছনে তিনটে রিকশাভ্যান বোঝাই মালপত্তর। তাতে ত্রিপল, বাঁশ, খাওয়ার চেয়ার টেবিল।

রাধাগোবিন্দ ডেকরেটর্সের লোকজন ছাদে ত্রিপল টাঙাতে গেলে মণিময় প্রত্যুষকে বললেন, "কী ব্যাপার বলো তো প্রত্যুষ?"

প্রত্যুষ হেসে বলল, "কিছু না, মৌপিয়ার একটু ইচ্ছে হল 'কলকাকলি'র অনাথ শিশুদের আর যেসব বাচ্চাদের ও পড়ায় তাদের একটু খাওয়াবে। বালকভোজন টাইপের আর কী!"

কোথা থেকে মৌপিয়া এসে বলল, "দাদুর ঘরটা একটু সাজালে হয় না? বাচ্চাগুলো আসবে। আর হ্যাঁ, কতগুলো বেলুনের একটু ব্যবস্থা কোরো তো। বাচ্চারা তো আবার বেলুন ভালবাসে। দাদুর ঘরটা সাজাবার দায়িত্ব তোমার। আমি একটু ছাদে যাই। দেখি প্যান্ডেলের লোকগুলো কী করছে। আর একটা কথা, হোম ডেলিভারির বাপ্পা এক্ষুনি আসবে। এলে আমাকে ডেকো।"

দুপুরবেলার মধ্যে সারা বাড়ি সাজানো-গোছানো সারা। মণিময়ের ঘরটা রঙিন কাগজ আর বেলুনে চেনাই দায়। অবশ্য অন্য ঘরগুলোও সাজানো হয়েছে ফুল আর কাগজ দিয়ে। মিকাডো ইলেকট্রিক থেকে একটা ছেলে এসে টুনিলাইট দিয়ে ঘর-বারান্দাটা খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে।

মণিময় আজকাল আগের মতো হাঁটাচলা করতে পারেন। তবে একটু ধীরে। এর জন্য সমস্ত কৃতিত্ব প্রত্যুষের। রোজ দু'বেলা প্রত্যুষ ঘণ্টাখানেক ধরে ফিজিওথেরাপি না করলে মণিময় এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারতেন না। মণিময় এর জন্য প্রত্যুষকে বলেছিলেন, "তোমার হাতে জাদু আছে।"

প্রত্যুষও বলেছিল, "আমার হাতের জাদু নয়, গোটা কৃতিত্বই ফিজিওথেরাপির বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ আর আপনার দ্রুত সেরে ওঠার মানসিক ইচ্ছের।"

মণিময় প্রত্যুষের মাসাজ গ্রহণ করার সময় তাঁর দুশ্চিন্তার কথা উগরে দিতেন। বলত, "দিনরাত শুধু দিদিভাইটার কথা ভাবি। আমি চোখ বুঝলে গোটা বাড়িতে একা থাকবে কী করে! ওর এই দুর্ভাগ্য মেনে নেওয়া যায় না। কী সংগ্রামটাই না করেছে!"

"দেখতে হবে তো কার নাতনি, কোন ফ্যামিলির রক্ত তার শিরায়। আমি শুনেছি ওর ঠাকুমা নাকি বিপ্লবীদের জন্য অ্যাপেন্ডিসাইটিসের যন্ত্রণা সহ্য করে ঢেঁকিতে শুধু চিঁড়ে কুটতেন না, ঢেঁকির খোদলে বিপ্লবীদের পিস্তলও লুকিয়ে রাখতেন।"

মণিময় মুচকি হেসে বলেছিলেন, "একথা তুমি কার থেকে শুনলে?"

"তরুবালা কাকিমার কাছে শুনেছি," বলে প্রত্যুষ হেসেছিল।

একথা সত্যি যে মণিময় মৌপিয়াকে নিয়ে আগে যতটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, এখন আর ততটা নয়। প্রত্যুষ তাঁকে কথা দিয়েছে ও যতদিন লক্ষ্মীপুরে থাকবে, ততদিন কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। মণিময় স্পষ্ট আঁচ করতে পারেন, একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে তাঁকে প্রত্যুষ কতটা শ্রদ্ধা করে। এই সেদিনও যখন প্রত্যুষ তাঁর সামনে মৌপিয়াকে বলেছিল, "জানো তো, আজকাল যখন দেখি কোনও হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ বা পুজো উদ্বোধন করতে কোনও সুযোগসন্ধানী তৃতীয় শ্রেণির নেতা বা টলিউডি নায়ক-নায়িকারাও ডাক পান, অথচ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা উপেক্ষিত থাকেন, তখন নিজের নাগরিকত্বের কথা ভেবে লজ্জা হয়," তখন গর্বে মণিময়ের বুকটা ফুলে উঠেছিল।

বিকেল হতে না হতেই মণিময়ের বাড়ি যেন শিশুতীর্থ হয়ে উঠতে শুরু করল। মণিময় তো আর স্বার্থপর দৈত্য নন যে শিশুরা ভয়ে মিইয়ে থাকবে। তারা এসেই ঘরময় ছোটাছুটি করতে লাগল। মণিময়ের বুকটা কেমন যেন ভরে উঠল। এই হাসিখুশি শিশুগুলো আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক, অথচ তিনি যখন এদের মতো শিশু ছিলেন, কতদিন যে শঙ্কায় কেটেছে, তা এখন মনে করতে পারেন না। তার প্রিয় ছোটকাকাকেই যখন একবার বিনা দোষে ব্রিটিশ পুলিশ মারতে-মারতে নিয়ে গিয়েছিল তখন মা, কাকিমাদের সঙ্গে সেও হাউ-হাউ করে কেঁদেছিল। তারপর থেকে গ্রামে অত্যাচারী সাহেব পুলিশ ঢুকলে তার মতো অসংখ্য বাচ্চাদের মনে হত যেন তাদের বাঘের খাঁচায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

অথচ আজকের বাচ্চারা কত প্রাণবন্ত, কত উজ্জ্বল।

গ্রামে অত্যাচারী সাহেব পুলিশ ঢুকলে তার মতো অসংখ্য বাচ্চাদের মনে হত যেন তাদের বাঘের খাঁচায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আজকের বাচ্চারা কত প্রাণবন্ত, কত উজ্জ্বল।

মণিময়ের অন্যমনস্কতার মাঝে মৌপিয়া এসে তাড়া লাগাল, "কই গো দাদু, নতুন পাঞ্জাবি আর ধুতিটা এখনও পরলে না!"

মণিময় বললেন, "কী শুরু করলি বল তো দিদিভাই! দুপুরে শ্যাম্পু দিয়ে মাথা ধুইয়ে দিলি। গন্ধসাবান দিয়ে স্নান করিয়ে দিলি। এখন আবার বলছিস নতুন পাঞ্জাবি পরতে। কেন রে দিদিভাই, আজ কি তোকে আবার কেউ দেখতে আসছে নাকি?"

"আসছেই তো!" বলে মৌপিয়া আদুরে মুখভঙ্গি করল।

"কে?"

"নতুন ইতিহাস।"

"সেটা আবার কী?"

"এত কথা বোলো না তো! চলো তোমাকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিয়ে দিচ্ছি।"

ঘটনাটা যে এভাবে বাঁক নেবে মণিময় ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি। পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারল, যখন সম্মিলিতভাবে বাচ্চারা তাকে ধরে নিয়ে সুসজ্জিত টেবিলের সামনে দাঁড় করাল। টেবিলের উপর সুবিশাল এক কেক। আর তাঁর চারপাশে ত্রিস্তরে সাজানো নব্বইটা টুনি মোমবাতি।

মণিময় এবার বলে উঠলেন, "ও, এবার বুঝেছি এতসব আয়োজন কীসের জন্য। তাই বলি, আমার ঘরটা এত ভাল করে সাজানো কেন। বাচ্চাদের হাতে এত বেলুন কেন। ওদের মাথায় 'হ্যাপি বার্থ ডে'

টুপি কেন!"
মৌপিয়া বলল, "আজ যে তোমার নব্বইতম জন্মদিন। সেটা তুমি ভুলে গেলে!"
মণিময় বিব্রত হয়ে বললেন, "সেটা না হয় মানলাম। তার জন্য এতসব আয়োজন না করলেই কি হত না?"
মৌপিয়া এবার প্রত্যুষকে দেখিয়ে বলল, "যা জিজ্ঞাসা করার ওকে জিজ্ঞেস করো। ওই কাণ্ডের মূল হোতা। আজকের যাবতীয় খরচের ভার সব ওর।"
মণিময় বললেন, "কেন এতগুলো টাকা খরচ করে এসব করতে গেলে?"
প্রত্যুষ বলল, "সরকার শুধু সেলেব্রিটি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্মদিন পালন করে। অন্যদের ভাগ্যে শুধু পেনশন বরাদ্দ। অন্ততপক্ষে যে গ্রামে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর বাস, সে গ্রামের কেউ তাদের গ্রামের অতি গর্বের মানুষটার জন্মদিন পালন করবে না এটা বড় বেমানান!" বলেই প্রত্যুষ এবার একটা প্যাকেট খুলে সমস্ত বাচ্চাদের হাতে কাগজের জাতীয় পতাকা তুলে দিল।
বাচ্চারা সমস্বরে বলে উঠল, "হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ!"
এভাবে কোনওদিন তার জন্মদিন পালন হবে তা মণিময়ের কল্পনাতীত। কেক কাটতে-কাটতেই চশমাটাকে আড়াল করলেন মণিময়। চোখের দু'কোণ যে ভিজে উঠেছে, অথচ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাঁদতে নেই।

॥ ১৬ ॥

আজ কৃষ্ণচূড়া গাছের ঠেকে চারজন বসে। শ্যামল, বিল্টু, দেবাশিস আর নারান। নারানের আসল নাম নারায়ণ। নারান পারলেই কথার মধ্যে ইংরেজি ভাষার জোগান দেয়। তার মধ্যে আশি শতাংশ ভুল। এর জন্য কম গাঁট্টাও খায় না। নারান ট্যাঁক থেকে খইনির ডিবে বের করল। তারপর বলল, "এটা কোথা থেকে ইমপোর্ট করা মাল বলতে পারিস?"
"বাপ রে! তুই আজকাল ইমপোর্ট করা খইনি খেতে শুরু করেছিস নাকি? তা কোথাকার খইনি? সুইজারল্যান্ড না সুইডেনের?" বলেই শ্যামল একটা মুখভঙ্গি করল।
নারান বলল, "ঢাকার।"
বিল্টু বলল, "ঢাকার বাঙালিরাও খইনি খেতে শুরু করেছে? তা ঢাকার খইনি তুই পেলি কী করে?"
"গতকাল আমার খুড়তুতো ভাই ঢাকা থেকে এদেশে ল্যান্ড করেছে। এটা ওর কালেকশন। নে নে এবার চোখে দেখ, হাউ টেস্টি!" বলেই নারান ডিবে থেকে খইনি বিতরণ করতে শুরু করল। তারপর খইনি ডলতে-ডলতে বলল, "জানিস তো আজ শেখরদা, কালীপদদা, নাঙ্কুদা আর বাবলুদা মিলে ট্রেকিংয়ে গেল। চল না, আমরা একবার ট্রেকিংয়ে যাই। হেভি থ্রিলিং ব্যাপার হবে।"
দেবাশিস বলল, "তুই যাবি ট্রেকিংয়ে! যে একটা উইয়ের ঢিপি ডিঙোতে গিয়ে হোঁচট খায়! ভিতু ফড়িংয়ের আবার চাঁদে যাওয়ার শখ!"
বিল্টু বলল, "তুই তার থেকে একটা কাজ কর। আগামী মাসে আমাদের ক্লাব থেকে সাইকেলে ভারতভ্রমণে রওনা দেবে সুব্রতদা, বলরামদা, পান্নাদা আর গানুদা। তুইও ওদের সঙ্গে যা। ওদের সাইকেলে পাম্প কমে গেলে পাম্প করে দিবি। তোর ডেজিগনেশন হবে 'হোল টাইমার পাম্পার।' "
এই কথা শুনে হাসির হিল্লোল উঠল। ওদের হাসির রেশ মেলাতে না মেলাতে দূর থেকে ওরা দেখতে পেল ওদের দিকে পামেলা আসছে।
শ্যামল বলল, "দেখেছিস, ম্যাডাম আজ কী চিকনাই দিয়েছে! পুরো লাল চুড়িদার। বনে যেন দাবানল লেগেছে," বলেই গানের কলি আওড়াল, "ও লাল দোপাট্টেওয়ালি তেরা নাম তো বতা... "
নারান বলল, "তুই যাই বলিস, ম্যাডাম কিন্তু হেব্বি এস্‌মার্ট।"
দেবাশিস বলল, "হ্যাঁ, একেবারে সদ্য মার্কেটে আসা লেটেস্ট ডিজাইনের মোবাইল।"
বিল্টু বলল, "ওভাবে বলিস না। প্রত্যুষস্যারের কাছে শুনেছি ম্যাডাম বেশ শিক্ষিত। ফ্রি-সেক্সের দেশে থাকে তাই ড্রেসটাই যা একটু হাই ভোল্টেজের। তবে আজকের ড্রেসটা কিন্তু কুল।"
পামেলা দ্রুত তাদের কাছে আসার জন্য গতি বাড়াল। ছেলেগুলোকে পামেলার ভাল লাগে। প্রত্যুষের কাছে শুনেছে ছেলেগুলো ভীষণ পরোপকারী। শুধু ঠেকে বসে আড্ডা মারে এই আর কী! এই তো সেদিন মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া লোকজনদের নিয়ে কী ছোটাছুটিই না করল ওরা! এর আগে তিনদিন ওদের সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রত্যুষই পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।
পামেলা ওদের কাছে এসে বলল, "তোমাদের সবার হাতে ওটা কী?"
নারাণ একটু হি হি করে হেসে বলল, "ম্যাডাম, দিস ইজ় নাথিং বাট টোবাকো লিফ।"
পামেলা ওদের সঙ্গে মজা করার জন্য বলল, "হেরোইন নয় তো?"
"কী যে বলেন ম্যাডাম! পুলিশ তা হলে ধরে প্যাঁদাবে, এই থুড়ি, বিটিং করবে," বলেই বোকাবোকা হাসল নারান। পরক্ষণেই বলল, "খইনি চেনেন ম্যাডাম, খইনি? এটা হল সেই খইনি।"
"তা ওটা করছ কী?"
নারান আবার হি হি করে হাসল। তারপর বলল, "এই মানে পাঞ্চিং পাঞ্চিং অ্যান্ড মেকিং ডাস্টিং।"
"নেক্সট?" পামেলা জানার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠল।
"নেক্সট? ইটিং।"
শ্যামল এবার নারানের কানের কাছে মুখ এনে বলল, "এই শালা, খইনি আবার ইটিং কীভাবে।"
নারান নিজের ভুল শুধরে নিয়ে বলল, "সরি ম্যাডাম, স্লিপ অফ টাং হয়ে গিয়েছে। ওটা হবে কিপিং।"
"হোয়াট টাইপ অফ কিপিং?"
নারান এবার তো-তো করে বলল, "ওই আর কী, কিপিং আন্ডার দি লকার অফ লিপ।"
পামেলা বলল, "আচ্ছা খইনি খেলে কী হয়?"
বিল্টু বলল, "আসলে খইনি খেলে মেজাজটা ফুরফুরে লাগে।"

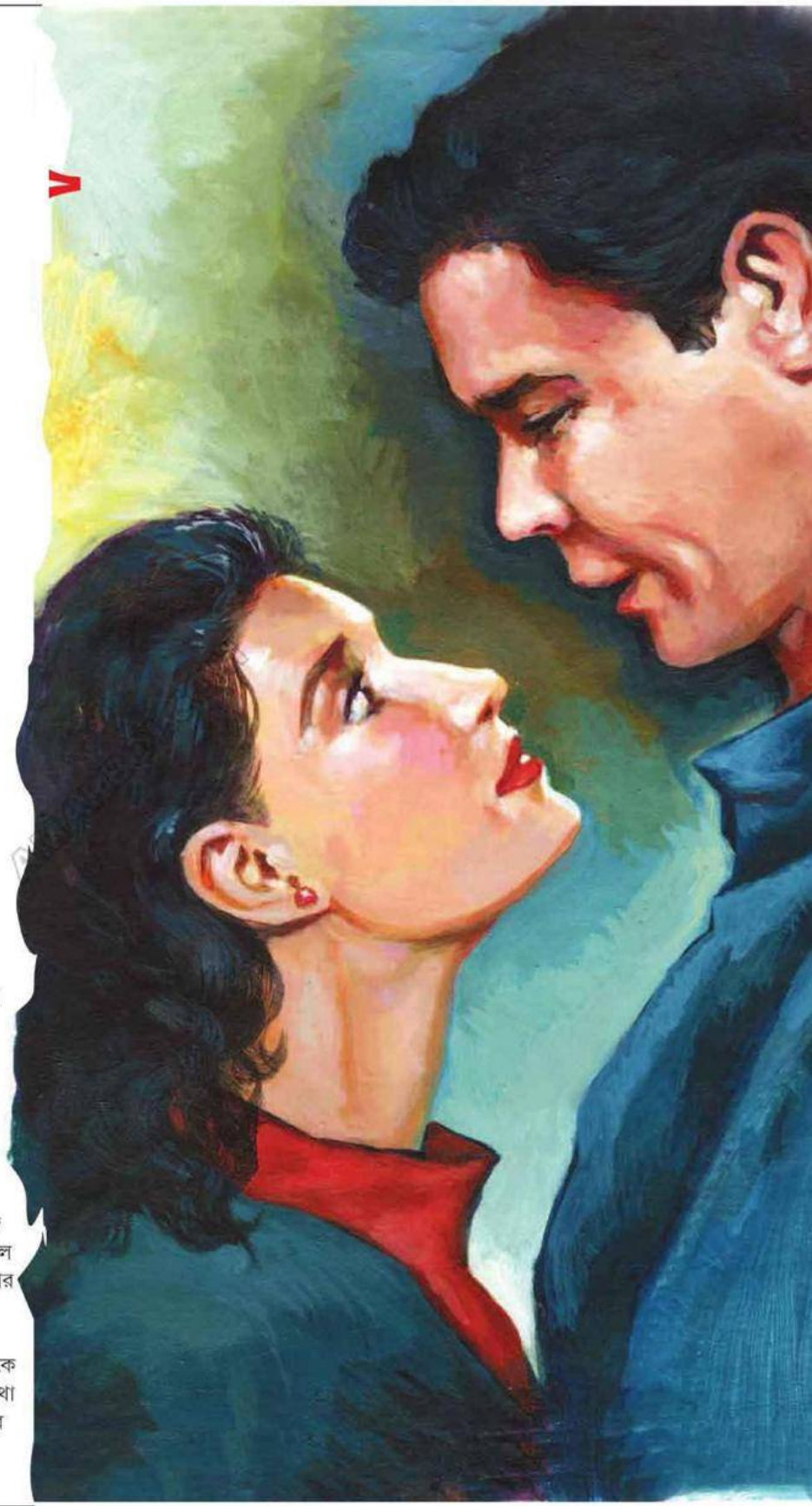

"ফুরফুরে মানে কী?"
বিল্টু এবার প্রতিশব্দ খুঁজে না পেয়ে বলল, "চখমা চাকুম আর কী!"
"চখমা চাকুম মানে?"
বিল্টু পড়ল মহাবিপদে। নিজের মনেই গজগজ করে উঠল, "দূর শালা, আমরা কি বাংলা অভিধান নাকি? নাকি সরকারি ট্রান্সলেটর?" উপায়ান্তর না দেখে কনুই দিয়ে ঠেলা দিল দেবাশিসকে।
দেবাশিস বলল, "সত্যি কথা বলতে কী ম্যাডাম, এটা ঠিক না খেলে বোঝা যায় না।"
পামেলা বলল, "তা হলে তো একটু খেয়ে দেখতে হয়। লিফ যখন, তখন ক্ষতি হবে না নিশ্চয়ই।"
"অ্যাঁ! আপনি খইনি খাবেন?" বলেই নারান বুকের ভিতর বুদবুদ কাটল। "কাম সারসে! এবার শালা, কীভাবে যে ম্যানেজ করা যায়! কী কুক্ষণে যে আজ খইনির ডিবেটা বের করলাম। এ ম্যাডাম ছাড়ন্তিস পার্টি নয়।"
"কই দাও!" বলেই পামেলা হাত বাড়াল।
বিল্টু এবার দেবাশিসের কানের কাছে মুখ এনে গজগজ বলল, "শালা সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। এইবারে বোঝো গাড়ল কোথাকার! বলতে পারলি না এটা হার্টের রোগ ঠেকাবার জন্য খাই।"
দেবাশিসও ফিসফিস করে জবাব দিল, "দাঁড়া তোর মেসেজটাই ই মেল করে দিচ্ছি," তারপর পামেলার দিকে তাকিয়ে বলল, "আসলে কী জানেন ম্যাডাম, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। এটা আমরা হার্টের রোগ এড়াবার জন্য খাই।"
"ভালই তো, আমারও একটু হার্টের প্রবলেম আছে।"

"ওটা হার্টের জন্য, বাট ফর মেল।"
"বাবা! হার্ট, ফুসফুসের আবার মেল-ফিমেল আছে নাকি? তা হলে তো হার্টের রক্ত, ফুসফুসের বাতাসেরও মেল-ফিমেল থাকা উচিত।"
নারান স্বগতোক্তি করল, "এ কার পাল্লায় পড়লাম রে বাবা! নাছোড়বান্দা টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি। এ যে দেখছি 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' ফিল্মের জিনাত আমনের মতো। পেলে ভাং, গাঁজা সব চাখতে চায়!" তারপর বিল্টুর কানে মুখ লাগিয়ে বলল, "কী রে শালা, আমাদের তূণ থেকে ছোড়া সব তিরগুলোকে তো পাটকাঠির মতো ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে।"
পামেলা আবার তাড়া দিল, "কী হল দাও! কী ভাবছ বলো তো? তোমাদের শেয়ারে কম পড়ে যাবে?"
"না, না, এর আর দাম কত! নিন হাত পাতুন..." বলে নারান পামেলার হাতে খইনি দেওয়ার পর চুন দিতে উদ্যত হলে বিল্টু ফিসফিস করে বলল, "তুই আবার চুনও দিচ্ছিস! আজ সব চুনকালি হয়ে যাবে।"
পামেলা বাঁ হাতে খইনি, চুন নিয়ে বলল, "হোয়াট নেক্সট?"
নারাণ এবার খইনি টেপার ইঙ্গিত করে বলল, "ম্যাডাম, ঠিক এভাবে ডলিং মানে প্রেশার অ্যাপ্লাইং।"
পামেলা বুড়ো আঙুল দিয়ে ছাপ দেওয়ার মতো চাপ দিল।
নারান বলল, "উঁহু ম্যাডাম, ওভাবে নয়। ওভাবে আমাদের দেশের অশিক্ষিত ভোটাররা থাম্ব ইম্প্রেশন দেয়। এইভাবে দেখুন," বলে নিজের হাতের খইনি টিপে দেখাল। আর বলতে থাকল, "এইভাবে আপ অ্যান্ড ডাউন, আপ অ্যান্ড ডাউন।"
দেবাশিস বলল, "ম্যাডাম, আপনার হাতটা কিন্তু নোংরা হয়ে যাবে।"
"তোমাদের হাত নোংরা হয় না?" হাসল পামেলা।
"হয় তবে আমরা ঝেড়ে নিই।"
"আই উইল অলসো ডু দ্যাট..." বলেই পামেলা বলল, "এভাবে কতক্ষণ রাব করতে হবে?"
"আনটিল গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়, ম্যাডাম।"
"ও মাই গড! এই সময়ে তো দশ কিলোমিটার কার ড্রাইভিং করা যায়।"
নারান বলল, "এই জন্যই তো বলেছিলাম এ ওষুধটা হার্টের। শুধু সময় ব্যয় হয় না, শক্তিরও সঞ্চার ঘটে। মানে স্ট্রেচিং অফ স্ট্রেংথ।"
"কীভাবে?" পামেলা কিছুটা বিস্মিত হল।
নারান বলল, "আপনি নিশ্চয়ই টের পাচ্ছেন। বুড়ো আঙুল দিয়ে যতই টেপা যায়, ততই গতিশক্তি, মানে স্পিডিয়াস স্ট্রেংথ আঙুল থেকে চলে যায় হাতে। মানে ওই ট্রান্সফরমেশন অফ পাওয়ার আর কী। তারপর হাত থেকে বুকে। বুক থেকে হার্টে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এনার্জি লিফ্‌টিং হতে-হতে তীরে আছাড় খাওয়ার মতো।"
পামেলা এবার হাতের মুঠো খুলে দেখিয়ে বলল, "দ্যাখো তো হয়েছে কি না?"
বিল্টু বলল, "হয়েছে তবে কোয়ার্টার ডাস্ট। খইনি গুঁড়ো করা অত সহজ কাজ নয় ম্যাডাম। কথাতেই আছে, 'আশি চুটকি নব্বে তাল, তব বনেগা খইনি কা হাল।' "
শ্যামল বলল, "ম্যাডাম, আমি ডলে দেব?"
দেবাশিস ফিক করে হাসল।
পামেলা খইনি ডলতে-ডলতে বলল, "তার আর দরকার নেই, আমি নিজের কাজ নিজে করতে ভালবাসি।"
শ্যামল বলল, "ম্যাডাম আমাদের জায়গাটা আপনার কেমন লাগছে?"
"খুব সুন্দর। অল ওভার গ্রিন। এখানে নদী আছে, মাঠ আছে। গাছ আছে, পাখি আছে, জমিদার বাড়ি আছে, শ্মশান আছে। প্রচুর বাচ্চা ছেলেমেয়ে আছে আর আছে তোমাদের মতো কিছু ভাল ছেলেরা।"
নারান বলল, "এনডিং লাইনটা লিখে দিলে বাঁধিয়ে রাখতাম।"
বিল্টু বলল, "আমরা ভাল হতে যাব কোন দুঃখে!"
পামেলা বলল, "নিমগাছ জানে না, সে কতটা এফেকটিভ। তার ধারণা সে শুধুই একটা তেতো গাছ," বলেই পামেলা আবার হাতের খইনিটা দেখালো।
নারাণ বলল, "হয়েছে। তবে হাফডাস্ট। ওটাই মারুন। ফুল ডাস্ট করতে গেলে আপনার বুড়ো আঙুলে ফোসকা পড়ে যাবে। নিন এবার ঠোঁটের ভিতর ইন করে হোল্ড করে রাখুন।"
পামেলা উপরের ঠোঁটটা টানতে গেলে নারান ঝটিতি বলল, "ওটাতে নয় ম্যাডাম। ওটা আপার লিপ, মানে ওষ্ঠ। আপনি লোয়ার লিপ ধরে আগে টানুন। লোয়ার লিপ মানে অধর। খইনি অধরেই ধরে রাখতে হয়।" বলে নারান নিজের অধর টেনে ধরে কীভাবে খইনি রাখতে হয়, সেটাই করে দেখাল।
পামেলা অধর ধরে টানতে গেলে বিল্টু চেঁচিয়ে উঠল, "ম্যাডাম, আপনার পিছনে ষাঁড়।"
পামেলা পিছনে তাকিয়ে একটা নধর ষাঁড় দেখে খইনি ফেলে একছুটে হিন্দু মিলন মন্দিরের চত্বরে গিয়ে উঠল। ষাঁড়টা শ্যামলদের বেঞ্চির পাশ দিয়ে হেলেদুলে চলে যাওয়ার পর পামেলা আবার তাদের কাছে এল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গভীর বিস্ময়ে বলল, "ষাঁড়টা তোমাদের কিছু করল না! হাউ স্ট্রেঞ্জ!"
নারান হেসে বলল, "ও আমাদের কোনওদিন কিছু করে না।"
"কেন?" আরও বিস্মিত হল পামেলা।
"উই আর সেম বার্ডস অফ সেম ফেদার কিনা। মানে এক জাতের কিনা।" নারানের হাসিটা আরও চওড়া হল।
"মানে?"
"অনেকেই আমাদের পাষণ্ড ভাবে। মানে পাপিষ্ঠ। আর পাষণ্ডের মধ্যে ষণ্ড আছে। বাংলায় ষণ্ড মানে ষাঁড়।"
পামেলা হো হো করে হেসে উঠল। বলল, "রিয়েলি, অল অফ ইউ আর ভেরি কালারফুল।"

মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক পাখি এপার থেকে উড়ে ওপারে উড়ে গেল। প্রত্যুষ তাই দেখে বলে উঠল, "এ জগতে মনে হয় পাখিরাই ভাল আছে। পাখিদের খুব মজা... লাইসেন্স, ভিসার দরকার হয় না।

॥ ১৭ ॥

জীবনে এই প্রথম প্রত্যুষের সীমান্তের কাঁটাতার দেখা। এধার-ওধারের তেমন কোনও পার্থক্য নেই। এদিকে গ্রাম, ওদিকে গ্রাম। এপারে ভারত, ওপারে বাংলাদেশ। শুধু মাঝখানে কাঁটাতারের বেড়া। এপারে বেশ কিছু চাষি চাষ করছে। ওপারের জমিতে খেতমজুরেরা জমি নিড়োচ্ছে। এপারে দু'জন বিএসএফ প্রহরী টহল দিয়ে যাচ্ছে সমানে। ওপারে কোথাও বিডিআর প্রহরী দেখা যাচ্ছে না।
ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে বসে প্রত্যুষ দাদুস্যার সনৎ ঘোষের সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক পাখি এপার থেকে উড়ে ওপারে উড়ে গেল। প্রত্যুষ তাই দেখে বলে উঠল, "এ জগতে মনে হয় পাখিরাই ভাল আছে। পাখিদের খুব মজা... লাইসেন্স, ভিসার দরকার হয় না। মনের সুখে এদেশ থেকে ওদেশ ঘুরে বেড়ায়। সত্যি খুব ভাল আছে

ওরা।"
সনৎস্যার মৃদু হেসে বললেন, "নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।"
প্রত্যুষ বলল, "কেন একথা বললেন স্যার?"
"কারণ ঘোর কলিকালে পাখিরাও আজ সুখে নেই। বিজ্ঞান, সভ্যতা আজ যতই এগোচ্ছে, পাখিদের সংকট ততই বাড়ছে। জানো কি পাখিরা আজ বিলুপ্তির পথে? কীটনাশকের প্রভাবে প্রচুর পাখি আজকাল মরে যাচ্ছে। এখন গাছের ফলফুল কাঁচা থাকতেই ছিঁড়ে নেওয়া হয়। সেসব ফলপাকুড় কার্বাইড দিয়ে পাকানো হয়। আমাদের অঞ্চলে আগে প্রচুর শকুন দেখা যেত। এখন একটাও শকুন দেখা যায় না। খরগোশ, কাঠবিড়ালিরাও উধাও। মৌমাছি, প্রজাপতির সংখ্যাও অনেক কমে গিয়েছে। অদ্ভুতভাবে চড়াই পাখি আর দেখা যায় না। সেদিন কাগজে পড়লাম মোবাইল টাওয়ার থেকে নির্গত হওয়া বিশেষ তরঙ্গের জন্য চড়াইপাখিসহ অন্যান্য পাখিরা সংশ্লিষ্ট অঞ্চল ছেড়ে পালাচ্ছে।"
প্রত্যুষ মুগ্ধ হয়ে সনৎস্যারের কথা শুনতে লাগল। সনৎস্যার এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। কুচুলিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক। পাঁচবছর হল অবসর গ্রহণ করেছেন। তবু শিক্ষকতার ব্রত থেকে আজও সরে যাননি। সারাজীবন শিশুদের নিয়ে কাটিয়ে গেলেন। শিশুদের কাছে তিনি দাদুস্যার। আশপাশের সবক'টা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। কারণ তিনি এখন ঘুরে-ঘুরে বেশ ক'টা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনা পারিশ্রমিকে পড়ান। পারিশ্রমিক না নেওয়াটাই তাঁর একমাত্র শর্ত। ইদানীং যে হাইস্কুলে বা মাদ্রাসায় শিক্ষকের পদ শূন্য আছে, পরিচালন কমিটির সাদর আহ্বানে সেখানেও পড়ান। কুচুলিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে-করতেই তিনি প্রাইভেটে এমএ পাশ করেন। বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান সব বিষয়ে তিনি দক্ষ। উচ্চশিক্ষা নিয়ে পাশ করলে হবে কী, আজও তিনি ছোট-ছোট শিশুদের পড়াতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। একটিমাত্র কন্যাসন্তান। মেয়ে বিয়ে করে এখন লিবিয়াতে থাকে। সাত বছর আগে স্ত্রী ক্যানসারে মারা গিয়েছেন। মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছেন, "শিশুদের জন্য কিছু কোরো। পারলে গরিব মেধাবী ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু কোরো।" সে কথা সনৎস্যার আজ অবধি মর্মে-মর্মে মনে রেখেছেন। তাই তো সুযোগ পেলেই আজকাল প্রত্যুষের সঙ্গে সাইকেলে বেরিয়ে পড়েন স্কুলছুট ছাত্রদের খোঁজে। সে তারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক, যে স্তরের হোক।
প্রত্যুষের সঙ্গে সনৎস্যারের আলাপ হয়েছিল নকপুল মোড়ে। প্রত্যুষ সেদিন কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে একটা হোর্ডিংয়ে 'গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান' বিষয়ক বিভিন্ন মজাদার ছবি আঁকছিল। আঁকার নেশাটা পেয়েছিল মৌপিয়ার কাছ থেকেই। মৌপিয়াই প্রত্যুষকে একটু-আধটু আঁকা শিখিয়েছিল। একমনে প্রত্যুষের আঁকা দেখার পর সনৎস্যার আলাপ করতে এসেছিলেন। বলেছিলেন, "আপনি তো বেশ মজাদার ছবি আঁকেন!" তারপর কথায়-কথায় বলেছিলেন, "শিশুরা নিজেদের চিনতে শেখে পোষা প্রাণীদের মধ্য দিয়ে। আপনি কি পারবেন এই অঞ্চলের নার্সারি আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেওয়ালগুলো ওই সমস্ত ছবি দিয়ে ভরিয়ে দিতে? যা খরচ লাগে আমি দেব।"
প্রত্যুষ কথা রেখেছিল। অবসর সময়ে সনৎস্যারের সবক'টা পরিচিত নার্সারি আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেওয়াল রাঙিয়ে দিয়েছিল বিভিন্ন কমিকস্ট্রিপের ও বিভিন্ন পোষা প্রাণীদের ছবি দিয়ে। টিনটিনের পোষা কুকুর কুট্টুস, স্কুবি ডু অ্যানিমেশনের কুকুর স্কুবি, অরণ্যদেবের সঙ্গী নেকড়ে বাঘ, শরৎচন্দ্রের মহেশ, হ্যারিপটারের প্যাঁচা হেডউইগ। কোনও-কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘরের দেওয়ালে ব্রতচারীর ছড়া, গানও লিখে দিয়েছে।
চা খেতে-খেতে প্রত্যুষ লক্ষ করল, কতগুলো বাচ্চাছেলে কাদামাখা তিন-চারটে সাইকেলের টায়ার একসঙ্গে দড়িতে বেঁধে হাত দিয়ে চালিয়ে-চালিয়ে আসছে। হঠাৎ একটা লোক "লাইন ক্লিয়ার" বলে চেঁচাতেই ছেলেগুলো হুড়মুড় করে কাঁটাতারের দিকে এগোতে লাগল।
প্রত্যুষ চা-ওয়ালাকে বলল, "কী ব্যাপার, বাচ্চা ছেলেগুলো কাঁটাতারের দিকে এগোচ্ছে কেন?"
চা-ওয়ালা মৃদু হেসে বলল, "গ্রিন সিগনাল পেল তাই। ওই যে শ্যাওড়ার ঝোপটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটাই ওদের ঢোকার গেট। ওই ঝোপের আড়ালে কাঁটাতারের তলা দিয়ে একটা বিরাট সুড়ঙ্গ তৈরি করা আছে। ওর মধ্যে দিয়ে টায়ারগুলো পাচার করবে ওরা।"
প্রত্যুষ বলল, "কিন্তু টায়ারগুলো তো পুরনো। কাদাবোঝাই।"
চা-ওয়ালা বলল, "ওগুলো আসলে একেবারে নতুন। পুরনোর মতো দেখানোর জন্য ইচ্ছে করে কাদা মাখানো।"
সনৎস্যার বললেন, "এই সমস্ত বাচ্চা ছেলেদের দিয়ে মাল পাচার হয় এখানে! আশ্চর্য!"
"আশ্চর্যের কিছু নেই," বলেই চা-ওয়ালা আবার হেসে বলল, "ওদের জীবনটা এভাবেই চলছে। ওরা এখন 'ক্যারিয়ার'। মশলাপাতি, ফল, ওষুধ, টায়ার থেকে যন্ত্রাংশ সবকিছু পাচার করতে ওরা এখন ওস্তাদ। এভাবে ওরা যদি রোজ একশো থেকে দু'শো টাকা আয় করে ওদের বাবা-মাকে সাহায্য করতে পারে, ক্ষতি কীসের? তবে ধরা পড়লে প্রহরীদের রুলের বাড়ি হজম করতে হয়, এই যা। কয়েকজনের পিঠ অবশ্য কালশিটের দাগে ভরে গিয়েছে। অবশ্য যারা দৌড়ে তুখোড়, তাদের ওরা কিছু করতে পারে না।"
প্রত্যুষ বলল, "যদি প্রহরীরা গুলি করে দেয়?"
চা-ওয়ালা এবার হো হো করে হেসে বলল, "এখানেই তো আইনের বড় ফাঁক। নাবালকদের গুলি করার অনুমতি নেই বলেই তো পাচারকারী চাঁইরা এ কাজে বাচ্চাদের নিয়োগ করে।"
প্রত্যুষ বলল, "এইভাবে স্কুলছুট ছেলেরা পাচারের মতো অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত, ভাবাই যায় না।"
চা-ওয়ালা বলল, "এ তো তবু ভাল। পেটের দায়ে বাচ্চারা আজ কীসব কাজ করছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।"
প্রত্যুষ বলল, "কী কাজ?"
"ফিরে যাওয়ার পথে বিনপুর হয়ে যাবেন। সোনাই নদীর তীরে হরিহর শ্মশানঘাটে একটু দাঁড়িয়ে গেলে সব বুঝতে পারবেন।"
চা-ওয়ালার কথা মতো হরিহর শ্মশানঘাটে প্রত্যুষরা পৌঁছেই যা দৃশ্য দেখল, তা আঁতকে ওঠার মতো। বছর বারোর একটি কিশোর জ্বলন্ত চিতার আগুন খুঁচিয়ে চলেছে।
আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর প্রত্যুষের ডাকে ছেলেটা কাছে এসে দাঁড়াল।
প্রত্যুষ বলল, "তোর নাম কী রে?"
"নিতাই কাঁড়ার।"
"মড়া পোড়াস যে, ভয় লাগে না?"
"কীসের ভয়? যাকে পোড়ালাম, সে তো ছাই হয়ে গেল। ছাইকে কেউ ভয় করে নাকি?"
"কেন, ভূতের ভয় নেই?"
"ভূতকে কেন ভয় করতে যাব? আমার নিজের নামই ভূত।"
"সে কী রে! মানুষের নাম আবার ভূত হয় নাকি?"
"হ্যাঁ, হয়। বন্ধুরাই তো আমার নাম দিয়েছে ভূত-নিতাই। কেউ আদর করে বলে ভূতনাথ। কেউ বলে কিম্ভূতকিমাকার!" বলেই হেসে উঠল নিতাই।
পরক্ষণেই নিতাই বলল, "আমি মড়া পোড়াতে পারি, কেবল চিতায় কাঠ সাজানোটা এখনও ভাল করে শিখতে পারিনি।"
"কিন্তু এত কিছু পেশা থাকতে তুই এই কাজ পছন্দ করলি কেন?"
"আসলে প্রথমে আমি বন্ধুদের সঙ্গে সোনাই নদীতে শ্মশান ঘাটের পয়সা

কুড়োতাম। শ্মশানযাত্রীরা নদীতে যে পয়সা ফেলত সেটাই আমরা জলে ডুবে কুড়োতাম। সকাল থেকে সন্ধে।"
"শীতকালে কী করতিস?"
"শীতকালেও ডুব দিয়ে পয়সা কুড়োতাম।"
"সে কী! ঠান্ডা লাগত না?"
"হ্যাঁ, কিন্তু শীতের চেয়ে তখন পয়সা কুড়োনোর আনন্দ বেশি ছিল।"
"তারপর?"
"পরে শ্মশানযাত্রীদের ফাইফরমাশ খাটতাম। তারপর মড়ার খাট-বিছানা পোড়ানোর কাজ পেলাম। শেষে একেবারে চিতার কাজে লেগে গেলাম।"
সনৎস্যার এতক্ষণ নিতাইয়ের কথা একমনে শুনছিলেন। এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, "হ্যাঁ রে, তোর বাবা-মা কেউ বারণ করল না?"
নিতাই বলল, "ডুব দিয়ে যখন পয়সা তুলতাম, তখন বাবা-মা বেঁচে ছিল। একদিন বাবা যখন বাড়ির পাশের মাঠে জনমজুরের কাজ করছিল, তখন সেখানে মা খাবার নিয়ে যাওয়ার পরই বাজ পড়েছিল। বাবা-মা দু'জনেই ছাই হয়ে যায়। তারপর আমি একা হয়ে গেলাম। তখন শ্মশানের কাজটা নিয়ে নিলাম। আমার মতো কাজ-না-জানা ছেলেকে কে কাজ দেবে বলুন? ভালই হল। ভগবান আমার বাবা-মাকে পুড়িয়েছে। এখন আমি মরা মানুষকে পোড়াই। শোধবোধ।"
সনৎস্যার বললেন, "পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করে না?"
নিতাই বলল, "করে তো। কিন্তু মড়া পোড়ানো ছেলেকে কে আর পড়াবে বলুন? বন্ধুরাই বলে, তুই তো এখন ডোম হয়ে গিয়েছিস।"
প্রত্যুষ বলল, "তা হলে এভাবেই কি সারাজীবন মড়া পুড়িয়ে যাবি?"
নিতাই বলল, "না। টাকাপয়সা জমিয়ে শ্মশানের পাশে একটা চায়ের দোকান করব।"
প্রত্যুষ বলল, "শ্মশানের পাশে কেন? লোকে তো জমজমাট এলাকায় চায়ের দোকান করতে চায়।"
নিতাই ম্লান হেসে বলল, "শ্মশানের গন্ধটা যে এখন আমার ভীষণ ভাল লাগে।"
ফেরার সময় প্রত্যুষ সনৎস্যারকে বলল, "যতদিন না স্থানীয় এবং আশপাশের স্কুলছুট বাচ্চা ছেলেমেয়েদের অভিশাপ মুক্ত করতে পারছি, ততদিন আমার শান্তি নেই।"
সনৎস্যার মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "আমিও তোমার সঙ্গে আছি। জীবনের বাকি দিনগুলোতেও যতদিন সুস্থ থাকব, ততদিন তোমার সঙ্গে থাকব।"

॥ ১৮ ॥

প্রত্যুষের মুখ থেকে খবরটা শোনার পরও কথাটা বিশ্বাস করতে চাইছিল না মৌপিয়া।
সারা মুখে কোজাগরী পূর্ণিমার দীপ্তি ছড়িয়ে বলল, "সত্যি?"
"হ্যাঁ, সত্যি," বলে প্রত্যুষ এবার মাথা নাড়ল।
মৌপিয়া আচমকা প্রত্যুষকে জড়িয়ে ধরে স্থির হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ভালবাসা, বিশ্বাস, নির্ভরতা, আনন্দ, হাসি, অনুভব সব যেন একাকার দুই হৃদয়ের কবোষ্ণ ওমে। দু'জনের হৃদয়ের মধ্যে একই পরিতৃপ্তির অন্তঃপ্রবাহ যেন গতিশীল।
মৌপিয়ার বাহুলগ্ন হয়ে প্রত্যুষ বলল, "এই, দাদু বাড়িতে না?"
মৌপিয়া একই ভাবে বাহুলগ্ন অবস্থায় স্থিতিশীল। আদুরে কণ্ঠে বলল, "দাদু ঘরেই আছে। তবে ঠাকুরঘরে। আধঘণ্টার আগে সন্ধ্যারতি থেকে উঠবে না।"
প্রত্যুষ এবার সাহসী হয়ে উঠল। তারপর মৌপিয়ার নাকে নাক ঘষে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিল ওর সারা গাল। আদরের উষ্ণ প্রস্রবণে মৌপিয়াও সমানভাবে ভেসে গেল। প্রত্যুষের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর ওর দু'টো ঠোঁটও প্রত্যুষের গালে খুঁজে বেড়াতে লাগল ভাললাগা আর ভালবাসার মায়াবী আবেশ। প্রেমপিয়াসী মানুষেরা এমন মুহূর্ত অন্তহীন সময় ধরে চায়। কিন্তু সময়ের বাস্তবতাই তাদের সজাগ করে দেয়।
মৌপিয়াও যেন এক ঘোর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে জেগে উঠল। শেষপর্যন্ত প্রত্যুষের বাহুপাশ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "এখন আমার কী যে ভাল লাগছে না! সত্যি এখন আমার সুসময় চলছে। একই বছরে তোমাকে পেলাম, আবার স্কুলের চাকরিটাও পেলাম। এ যেন জীবন উপচে পাওয়া। জানো তো, তোমাদের স্কুলে আমি প্যারাটিচার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি খবরটা দাদু জানতে পারলে ভীষণ খুশি হবে। দাদুরও খুব ইচ্ছে ছিল আমি যেন ধারেকাছে কোনও স্কুলে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে একটা কাজ পাই।"
স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলে মৌপিয়ার প্যারাটিচার হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার খবরটা আজ স্কুলে গিয়েই প্রধানশিক্ষক মাখনবাবুর কাছ থেকে পেয়েছিল প্রত্যুষ। খবরটা তখনই মোবাইল মারফত জানাতে পারত মৌপিয়াকে। কিন্তু ফুলের তোড়াটা দেওয়া হত না, তাই খবরটা চেপে গিয়েছিল। শুধু বলেছিল, "আজ তোমাকে একটা সারপ্রাইজ় দেব। তুমি আমাকে কী দেবে বলো?"
মৌপিয়া বলেছিল, "আগে তো সারপ্রাইজ়টা পাই। তারপর প্রাইজ়টা তুমি পাবে।"
মৌপিয়া এবার মৃদুকণ্ঠে বলল, "এবার বলো তুমি কী চাও?"
প্রত্যুষ বলল, "আমি তো না চাইতেই উপহারটা পেয়ে গিয়েছি। এর চেয়ে বড় উপহার আর আছে কি?"
সত্যিই তো, একজন প্রেমিকের কাছে প্রেমিকার আকুল আলিঙ্গনের থেকে অন্য কোনও উপহার কি বড় হতে পারে?
মৌপিয়ার এই সাফল্যের পিছনে অবশ্য প্রত্যুষেরও অবদান কম নয়। সবচেয়ে বড় বাধা ছিলেন ললিতবাবু। ললিতবাবুর সঙ্গে প্রত্যুষের সম্পর্ক এখন আদায়-কাঁচকলায়। ঈর্ষার ভূতটা আজও ললিতবাবুর সঙ্গ ছাড়েনি। কিন্তু প্রত্যুষ কোনও ঈর্ষাকে আজও আমল দেয় না। ওর কাছে ঈর্ষা হল বাছুরের শিং। ক্ষমতা নেই, কিন্তু ঢুঁসোতে ওস্তাদ।

ললিতবাবুর সঙ্গে প্রত্যুষের সম্পর্ক এখন আদায়-কাঁচকলায়। ঈর্ষার ভূতটা আজও ললিতবাবুর সঙ্গ ছাড়েনি। কিন্তু প্রত্যুষ কোনও ঈর্ষাকে আজও আমল দেয় না।

প্রধানশিক্ষকের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হওয়ায়, প্রথম থেকেই প্রত্যুষ ললিতবাবুর বিরাগভাজন ছিল। তারপর ক্রমশই সবকাজে প্রত্যুষের ডাক পড়ায় সে ললিতবাবুর আরও চক্ষুশূল হয়ে পড়ে। গোটা খেলাধুলো বিভাগটা এখন প্রত্যুষই সামলায়। তারপর কালচার সেকশনের যাবতীয় ভার প্রধানশিক্ষক ললিতবাবুর কাছ থেকে নিয়ে প্রত্যুষকে দিয়েছেন এই অজুহাতে যে, ছাত্রদের উদ্দীপ্ত করা এবং তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনার ব্যাপারে প্রত্যুষের প্রতিভা অনস্বীকার্য। স্কুলের উন্নয়নজনিত নানাবিধ প্রস্তাব এবং ইমপ্রোভাইজ়েশনের ব্যাপারে

প্রত্যুষের দক্ষতার কথা অন্যান্য শিক্ষকরা মেনে নিলেও ললিতবাবু কোনওদিন স্বীকার করেননি। উপরন্তু একদিন স্টাফরুমে অন্যান্য শিক্ষকদের সামনে ললিতবাবু তাকে আঙুল উঁচিয়ে এও বলেছিলেন, "আমার নামে ছাত্র খেপানো! আমিও একদিন দেখিয়ে দেব কী করে আপনাকে স্কুল থেকে তাড়াতে হয়।" স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক অলোকবাবু, সাগরবাবু, কৌশিকবাবু, সঞ্জয়বাবু আর নির্মলবাবু তার হয়ে কথা বললেও একান্তে একদিন সাগরবাবু তাকে ডেকে বলেছিলেন, "ললিতবাবুকে ঘাঁটিয়ে কোনও লাভ নেই। নামেই উনি শিক্ষক। মানুষ হিসেবে উনি খাটা পায়খানার বাঁশ। নাড়ালেই দুর্গন্ধ ছড়ায়। আসলে চাঁদু ঘোষাল যে ওঁর মামা। তাই উনি ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। কাউকে তোয়াক্কা করেন না। স্কুলের বাইরে রাজনীতি করেন সবার সামনে, একেবারে প্রত্যক্ষভাবে।"
প্রত্যুষ রসায়নের শিক্ষক তাপসবাবুর কাছে এও শুনেছে যে, ললিতবাবুর রিক্রুটমেন্টটা হয়েছিল চাঁদু ঘোষালের প্রভাবেই। তখন তো আর স্কুলের শিক্ষক নির্বাচনে সরকারি তরফে এত কড়াকড়ি ব্যবস্থা ছিল না।
মৌপিয়ার মনোনয়ন আটকেই যেত, যদি না প্রত্যুষ সেক্রেটারি দেবদুলালবাবু এবং প্রধান শিক্ষককে একটা কথা বলত। মৌপিয়ার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ললিতবাবুর দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়। চাপটা তাই কম ছিল না। কিন্তু প্রত্যুষের যুক্তিটা ছিল অমোঘ। মৌপিয়া শুধু মাধ্যমিকে দ্বিতীয় এবং উচ্চ মাধ্যমিকে চতুর্থ স্থানই অধিকার করেনি, সে এই গ্রামেরই অতি গর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামী মণিময় সেনগুপ্তর একমাত্র নাতনি। মৌপিয়াকে মনোনীত করলে মণিময় সেনগুপ্তর মতো দেশপ্রেমী মানুষকেও এ গ্রামের তরফ থেকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়া যাবে। বৃদ্ধ মানুষটার শেষ জীবনের সুখ, আনন্দের ভাগীদারও আমাদের স্কুল হতে পারবে। প্রত্যুষের এই যুক্তিটাই দেবদুলালবাবু আর মাখনবাবু তুলেছিলেন ম্যানেজিং কমিটির মিটিংয়ে। এরপর মৌপিয়ার মনোনয়নে আর কোনও কথা ওঠেনি।
এসব কথা প্রত্যুষ কোনওদিনই মৌপিয়াকে বলবে না। স্কুল-রাজনীতির বিষবাষ্পের কথা এখনই মৌপিয়া জানুক, প্রত্যুষ তা চায় না। ও শুধু কথায় কথায় বলল, "মৌপিয়া, তুমি স্কুলের সব শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে একইরকম নম্র ব্যবহার কোরো। কোনও উত্তেজনায় কান দিয়ো না। প্রতিটি মানুষকে কর্মক্ষেত্রে আগে ধাতস্থ হতে হয়। "
মৌপিয়া যেন প্রত্যুষকে নতুন রূপে চিনছে, জানছে এমনভাবে তাকিয়ে রইল। প্রত্যুষকে যেন আজ কথায় পেয়েছে। একটু দম নিয়ে বলল, "মৌপিয়া তুমি এখন আর নিছক বাড়িতে পড়ানো প্রাইভেট টিউটর নও। তুমি বড় স্কুলের একজন শিক্ষক হতে চলেছ। তাই তোমার এটা জেনে রাখা দরকার যে, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে টেকনিকের চেয়েও বড় কথা, কীভাবে তুমি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে। একটা ক্লাসরুম হল লাঙলচষা জমির মতো। আর-একজন শিক্ষক হল সেই অভিজ্ঞ কৃষক, যিনি জানেন কীভাবে সে জমি জ্ঞান, উদ্দেশ্য, বিশ্বাস আর মূল্যবোধের সার, বীজ, তেল আর পরিচর্যায় চাষযোগ্য করে তুলতে হয়। আর একটা কথা সবসময় মনে রাখবে যে একজন চলনসই মানের শিক্ষক শুধু শিক্ষাদান করেন, একজন মধ্যমমানের শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের প্রেরণা যোগান, আর একজন উত্তমমানের প্রকৃত শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহের মাত্রা তীব্রভাবে বাড়িয়ে দেন। তোমার কাজই হবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথার্থ আগ্রহ সৃষ্টি করা।"
মৌপিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রত্যুষকে বলল, "ভাবতে ভাল লাগছে যে, কর্মক্ষেত্রের সমুদ্রে তোমাকে এখন থেকে লাইফ বোটের মতো সবসময় পাশে-পাশে পাব বলে।"

॥ ১৯ ॥

সকাল দশটায় পামেলার ফোন পেল প্রত্যুষ। প্রত্যুষদের স্কুল আজ বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য ছুটি। 'কলকাকলি'-র ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রত্যুষ যমুনার পারে খোলা মাঠে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। ওপারে জমিদার বাড়ির সামনের মাঠে ঘুড়ির মেলা। প্রত্যুষ ঘুড়ি ওড়াতে বরাবর ভালবাসে। কলকাতায় নিজেদের বাড়ির ছাদেও প্রত্যেক বিশ্বকর্মা পুজোয় ঘুড়ি ওড়াত। পেটকাটি, চাঁদিয়াল, বলমার, মোমবাতি, ময়ূরপঙ্খী... কতরকম নাম আর কতরকমের ঘুড়ি। আগের দিন মাঞ্জা দেওয়া সুতো আর দু'ডজন ঘুড়ি কিনে রাখত। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ভোর হলেই লাটাইভরা সুতো আর ঘুড়ি নিয়ে ছাদে উঠে যেত। দিনভর চলত ঘুড়ি কাটাকাটির খেলা। প্রত্যুষের সঙ্গে ওর বন্ধুবান্ধবরাও থাকত। সেসব দিনের কথা মনে পড়লে খুশিতে মনটা নেচে ওঠে। আজকে 'কলকাকলি'-র ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ানোর সঙ্গে স্মৃতির ডলফিনটাও মনের সাগরে ভেসে উঠছে। আর সুখস্মৃতিচারণার মজাটাই আলাদা। তবে লক্ষ্মীপুরের আকাশে বাতাসের টানটা সুতীব্র। যমুনা নদীর বুক থেকে উঠে আসা বাতাসের তীব্রতায় ঘুড়িগুলো যেন জেট প্লেনের মতো সাঁ করে উড়ে যেতে থাকে। আর সুতো ছাড়লেই হল। ঘুড়িকে সামাল দেওয়াটাই তখন দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।
প্রত্যুষ ঘুড়ি ওড়াতে সত্যিই দক্ষ। তার হাতের কারিকুরিতে ঘুড়ির চল দেওয়া, গোঁত খাওয়ানো, টান দেওয়া কিংবা অন্য ঘুড়ি লটকানো দেখে বাচ্চারা ঘন-ঘন হাততালি দিয়ে ওঠে। এভাবে কিছুক্ষণ চলতে থাকার পর প্রত্যুষ কিছু বাচ্চাদের হাত ধরে যখন ঘুড়ি ওড়ানো শেখাচ্ছিল, ঠিক তখনই পামেলার ফোনটা এল।
প্রত্যুষের বুকপকেটে মোবাইলটা রাখা ছিল। ফোন রিসিভ করতেই পামেলার সুরেলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "এক্ষুনি একটু আসতে পারবেন?"
"কেন?"
"বিশেষ দরকার আছে।"
"কিন্তু আমি যে বাচ্চাদের সঙ্গে এখন ঘুড়ি ওড়াচ্ছি।"
"সারাদিন শুধু বাচ্চাদের নিয়ে পড়ে থাকলে হবে? আপনার কি নিজস্ব জীবন থাকতে নেই?"
"আছেই তো।"
"তবে?"
"এই যে বাচ্চাদের সঙ্গে মিশে আনন্দের ভাগীদার হওয়া, এতে কি জীবন উপভোগের গন্ধ পাওয়া যায় না?"
"আপনি এবার থেকে একটু লেখালিখিটা প্র্যাকটিস করুন তো!"
"কেন?"
"আপনার কথাতে সবসময় একটা লেখক-লেখক গন্ধ।"
"ওরে বাবা! এ তো বিশাল সার্টিফিকেট! আপনি রেললাইনের পাশের বুনো ফুলকে একেবারে পদ্মফুল বানিয়ে ছাড়লেন।"
"কথায় আমি কোনওদিনই আপনার সঙ্গে পারব না। সে যাই হোক, আসছেন তো?"
"এক্ষুনি? আর এক ঘণ্টা পরে গেলে হবে না?"
"ঠিক আছে, তাই না হয় আসুন। একটা কাফসিরাপ নিয়ে আসতে পারবেন?"
"ঠান্ডা লাগিয়েছেন বুঝি? ঠিক আছে নিয়ে যাব।"
এক ঘণ্টা পর একটা কাফসিরাপ নিয়ে প্রত্যুষ হাজির হল দেবদুলালবাবুদের বাড়ি। ঘরে ঢুকে রীতিমতো অবাক।
"কী হল? বাড়িতে কেউ নেই?"
"না। আপনাকে ফোন করার একটু আগে মেসো আর মাসি হাবড়া গিয়েছে, মেসোর এক বন্ধুর বাড়ি। বিশ্বকর্মা পুজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। বলেই দিয়েছে আসতে-আসতে সেই বিকেল।"
কথা বলতে-বলতে পামেলা প্রত্যুষকে নিয়ে তার বেডরুমে ঢুকল। দোতলার এই ঘরটা দারুণ সুন্দর। জানালাগুলো খোলা থাকলে ঘরটা আলোয় ভরে ওঠে। ঘরটা পরিপাটি করে সাজানো।
প্রত্যুষ খুব আড়ষ্ট হয়ে বিছানায় বসল। পামেলা মৃদু হেসে বলল, "আচ্ছা

বলুন তো, আপনাকে এত আনইজি, ইনার্ট, হেজিট্যান্ট লাগছে কেন? বাচ্চাদের মাঝে তো কত লাইভলি, চিয়ারফুল থাকেন।"
প্রত্যুষ বলল, "বাচ্চাদের পরিবেশ আর এখানকার পরিবেশ তো এক নয়।"
"মানে? আমি কি বাঘ না ভালুক? নাকি তার চেয়েও হিংস্র কোনও জীব?"
"না, না, তা কেন?" বলে প্রত্যুষ কাফসিরাপটা এবার পামেলাকে দিল। বিছানার উপর রাখা ছিল পামেলার পার্স আর মোবাইল। পামেলা পার্সটার দিকে হাত বাড়াতেই প্রত্যুষ বলল, "আমি কিন্তু সিরাপটার দাম নিতে পারব না," পরক্ষণেই প্রসঙ্গ পালটাতে প্রত্যুষ বলল, "আজ আকাশটা দেখেছেন?"
"আজ কেন, আমি প্রত্যেকদিনই আকাশ দেখতে ভালবাসি। সূর্য, আকাশ, তারা আমার ভীষণ ভাল লাগে। জানেন তো, সুনীতা উইলিয়মসকে আমি খুব ঈর্ষা করি। কী সুন্দর মহাকাশে ভেসে বেড়ান! ক্যান ইউ ইম্যাজিন, একজন ভারতীয় মহিলা মহাকাশচারী হয়ে একটানা একশো পঁচানব্বই দিন মহাকাশে কাটিয়ে বিশ্বরেকর্ড করেছেন। মহাকাশে হেঁটে বেড়ানোর কথা ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা দেয়।"
প্রত্যুষ বলল, "আকাশ আপনার খুব ভাল লাগে, এ তো খুব ভাল কথা। কিন্তু আজকের আকাশের মাহাত্ম্য আলাদা, এটা কি জানেন?"
"মানে?"
"আজকের আকাশে বাঙালির আনন্দ, উচ্ছাস আর উচ্ছলতা সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়। গোটা আকাশকে যেন ছুঁয়ে ফেলতে চায়।"
"মানেটা ঠিক বুঝলাম না।"
"আজ বিশ্বকর্মা পুজো। বাঙালির এক প্রিয় উৎসব ঘুড়ি ওড়ানো। ঘুড়ি ওড়ানোর যে কী মজা, তা যারা ওড়ায় না তারা বুঝতে পারবে না। আপনি কি ঘুড়ি উড়িয়েছেন কোনওদিন?"
"না। কাটা ঘুড়ি দেখতে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। কাটা ঘুড়ির যন্ত্রণা জানেন?"হঠাৎ এসব কথা বলছেন কেন?"
"ছাড়ুন এসব কথা। জানেন, মেসো আপনার আর আমার মধ্যে একটা ইম্যাজিনারি রিলেশনশিপ গড়ে ফেলেছে। এমনকি আজকাল এ নিয়ে পারসিফ্লেজ করতেও ছাড়ছে না।"
"পারসিফ্লেজ মিন্‌স?"
"জোক।"
"জোকের কী আছে? সম্পর্ক ইজ সম্পর্ক।"
পামেলা এবার মৃদু হাসল। তারপর বলল, "তা হলে আপনি আপনার আর আমার মধ্যেকার সম্পর্কটা মেনে নিচ্ছেন?"
"হ্যাঁ। বন্ধুত্বের সম্পর্ক না মানার কী আছে?"
হাসিভরা পামেলার মুখে যেন হঠাৎ পাওয়ার কাট হল। বলল, "ওনলি ফ্রেন্ডশিপ?"
"হ্যাঁ, ফ্রেন্ডশিপের থেকে আর ভাল কিছু আছে নাকি? বন্ধুত্ব হল অন্ধকারের মধ্যে প্রকৃতির ফসফরাসের নিজস্ব আলোর মতো।"
"কিন্তু আমি তো ফসফরাসের কৃত্রিম আলো হতে চাইনি!" বলেই হঠাৎ কাশতে লাগল পামেলা।
প্রত্যুষ কাফসিরাপের শিশি থেকে মুখের কাপ খুলে তাতে সিরাপ ঢেলে পামেলার দিকে এগিয়ে দিল। পামেলা হাতে নিয়ে খেতে যাওয়ার সময় এমন প্রবলবেগে তার কাশি উঠল যে তার হাতের ঝটকায় পুরো সিরাপটাই প্রত্যুষের বুকের ফাঁক গলে জামা, গেঞ্জিতে লেগে একাকার। পামেলা এবার প্রত্যুষের হাত থেকে শিশিটা নিয়ে গলায় কিছুটা ঢেলে নিয়ে প্রত্যুষের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

পামেলা হাতে নিয়ে খেতে যাওয়ার সময় এমন প্রবলবেগে তার কাশি উঠল যে তার হাতের ঝটকায় পুরো সিরাপটাই প্রত্যুষের বুকের ফাঁক গলে জামা, গেঞ্জিতে লেগে একাকার।

প্রত্যুষের গা থেকে জামা আর গেঞ্জিটা খুলে বলল, "আপনি একটু বসুন, আমি তাড়াতাড়ি আপনার জামা আর গেঞ্জিটা ধুয়ে দিই। তা না হলে সিরাপের দাগটা যাবে না। ছাদে এখন কড়া রোদ আছে। জামা-গেঞ্জিটা শুকোতে বেশি সময় লাগবে না।"
দশ মিনিটের মাথায় পামেলা এল। পুরোপুরি ঘরোয়া ড্রেস পরে। ওর পরনে এখন অত্যন্ত হালকা কাপড়ের নাইটি। হলুদ নাইটির অন্তর্বাসগুলোও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।
পামেলা ঘরে ঢুকে একদৃষ্টিতে প্রত্যুষের রোমশ বুকের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। পরক্ষণে বলল, "সত্যি, আপনার দারুণ ফিজিক। একেবারে গ্রিক দেবতার মতো।"
প্রত্যুষ হাসল। বলল, "দেবতা-টেবতা নয়। ফিজিকাল এডুকেশনের টিচার। তাই নিজের শরীরটা সবসময় ফিট রাখতে হয়। একটু-আধটু ব্যায়াম করি, এই যা।"
পামেলা এবার বলল, "একটা সত্যি কথা বলবেন?"
"হ্যাঁ, বলুন।"
"মৌপিয়ার সঙ্গে আপনার ঠিক কীসের রিলেশন?"
"সহমর্মিতার।"
"তার মানে তো সিমপ্যাথি?"
"হ্যাঁ।"
"ওনলি কমপ্যাশন টু ইচ আদার?"
"হ্যাঁ।"
"সেজন্যই কি একই স্কুলে মৌপিয়াকে অ্যাজ আ প্যারাটিচার সিলেক্ট করার জন্য আপনার একান্ত প্রয়াস ছিল? সেজন্যই কি টিফিনে আপনারা ভাগাভাগি করে টিফিন খান?"
প্রত্যুষ প্রতিবাদ করে বলল, "প্রথম কথাটা সত্যি। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটা একেবারে অ্যাবসার্ড। বানানো। তার আগে বলুন তো কে এসব রটিয়েছে?"
"গতকালই ললিতবাবু মেসোর কাছে এসে এসব কথা বলেছেন।"
"ললিতবাবু এখানেও এসেছেন! যা হোক কিছু গুলগপ্পো বানিয়ে কান ভাঙাতে এসেছে। এতটা নীচ!"
"আচ্ছা বলুন তো, মৌপিয়া ঠিক কেমন মেয়ে?"
"আপনি কি ললিতবাবুর মতো অকারণ ঈর্ষায় ভুগছেন? ঈর্ষা হল একটা মাছির মতো, যে শুধু ক্ষত খুঁজে বেড়ায়।"
"আমি মাছিও নই, আবার কানামাছিও খেলতে পারি না। আই অলওয়েজ কল আ স্পেড আ স্পেড।"
পামেলা হঠাৎ তার পরনের নাইটিটা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে খুলে ফেলে বলল, "দেখুন তো আমার এমন কী নেই, যা মৌপিয়ার আছে? আমি উঁচুবংশের মেয়ে, উচ্চশিক্ষিতা, ভোঁতা ইংরেজিও উচ্চারণ করি না। বাদবাকি থাকে তো শারীরিক খুঁত। হয়তো বলতে পারেন আমার লজ্জাহীনতার কথা। কিন্তু ঈশ্বর যা সৃষ্টি করতে লজ্জাবোধ করেন না, মানুষ তার প্রকাশে কেন লজ্জিত হবে?"
প্রত্যুষ অবাক হয়ে ভাবল, এ কোন অদ্ভুত জীবনদর্শন! নাকি ফ্রি সেক্সের

দেশের যুবক-যুবতীদের সম্বন্ধে যে কথাটা চালু আছে, সে কথাটাই সত্যি। 'সেক্স ইজ লাইক রাইডিং আ বাইসাইকেল'। যে একবার সাইকেল চালাতে শিখেছে, সাইকেল দেখলেই তার মন উসখুস করে। চেপে বসতে ইচ্ছা করে। ওটা আর কিছু নয়, অভ্যেস। তাই সুযোগ পেলে যৌনতা অবদমিত করে রাখতে পারে না।

প্রত্যুষ চুপ করে থেকেই যেন প্রশ্ন করে পামেলার উদগ্র কামনাকে। এই কি সেই আদিম রিপু, যা সত্যের স্বাভাবিকতাকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলে? রিপু যাকে শাসন করে সে তো দাসদের চেয়েও অধম।

বিস্ময়বিমূঢ় প্রত্যুষকে একেবারে বিবশ করে দিতেই এবার দুটো হ্যাঁচকা টানে পামেলা ওর অন্তর্বাসগুলোও খুলে ছুড়ে মারল বিছানার ওপর। প্রত্যুষ হতবাক। প্রত্যুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। প্রত্যুষ স্থিতধী থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করল। মনে তার হাজারো প্রশ্নের জলবিম্ব। এ কোন অশোভন আচরণ? প্রকৃত ভালবাসার অজুহাতে তো এভাবে শরীরের সমস্ত লজ্জা বিজ্ঞাপিত করা যায় না। তবে কি পামেলা যৌন-বিকারগ্রস্ত? সেক্স ম্যানিয়াক, নাকি সেক্স-স্টার্ভড? ভালবাসার সংজ্ঞা কি এতই মেঠো? হঠাৎ পামেলা 'আপনি' সম্বোধন ছেড়ে প্রত্যুষকে 'তুমি' সম্বোধন করে বলল, "তুমি রবীন্দ্রনাথ পড়োনি প্রত্যুষ? 'শূন্য ভিক্ষাপাত্রের মতো ভারী জিনিস জগতে আর কিছুই নেই।' আমার শূন্য ভিক্ষাপাত্র তুমি ভরিয়ে দাও প্রত্যুষ।"

প্রত্যুষ এতক্ষণ পর এবার মুখ খুলল। বলল, "যেখানে মনের মিল নেই, সেখানে শারীরিক মিলনের কথা ভাবা আমার পক্ষে অসম্ভব। ইচ্ছের বিরুদ্ধে, রুচির বিরুদ্ধে শারীরিক চাহিদা, আমার কাছে নিছক যৌন তাড়না ছাড়া আর কিছুই নয়।"

পামেলার চোখের ভাষায় হঠাৎ বিবর্তনের ছবি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তবে তা প্লেটোনিক প্রেমের ছায়া নয়। শুধুই বিনম্র আবাহন। এসো। পা রাখো আমার শরীরের সৈকতে। তারপর ডুব দাও গভীরে, আরও গভীরে।

"কাম অন প্রত্যুষ। কাম অন!" বলেই প্রত্যুষের রোমশ বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পামেলা হারিয়ে যেতে থাকল। তারপর চুমোয়-চুমোয় ভরিয়ে দেওয়ার প্রবল স্পৃহায় যখন পামেলা প্রত্যুষের ঠোঁটে নিজের ঠোঁট রাখতে গেল, তখনই বেজে উঠল তার ফোনটা।

প্রত্যুষ এই সুযোগে ছিটকে গিয়ে বলল, "আগে ফোনটা ধরুন।"

ফোনটা ধরেই পামেলা আঁতকে উঠল, "কী বলছ মম! ড্যাডির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে! এখন অবজ়ারভেশনে! আমি আগামিকালই ফ্লাইট ধরছি।"

পামেলা মোবাইলটা রেখে আকুলভাবে কেঁদে উঠল।

কী অদ্ভুত দৃশ্যপট পরিবর্তন!

প্রত্যুষ কী করবে ভেবে পেল না। জানালা দিয়ে শুধু দেখল একটা কাটা ঘুড়ি উড়ে যাচ্ছে।

প্রত্যুষের পামেলার কথাটা মনে পড়ল, 'কাটা ঘুড়ির যন্ত্রণা কী জানেন?' ব্যাপারটা কি আজ সত্যি কাকতালীয় ভাবে ঘটল? প্রত্যুষের সার্বিক প্রত্যাখ্যান, নিউ ইয়র্কে পামেলার বাবার অ্যাক্সিডেন্ট, সবটাই তো কাটা ঘুড়ির পরিণতি।

বিবসনা পামেলা তখনও দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে চলেছে। এই প্রথম পামেলাকে প্রত্যুষের একেবারে অন্যরকম মনে হল। নয়নবিমোহন উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে যেন এক অনিন্দ্যসুন্দর জলপ্রপাত। এমন অবিস্মরণীয় দুর্লভ ছবি কি কোনওদিন কোনও চিত্রকর এঁকেছে?"

॥ ২০ ॥

রাস্তার মোড়ে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা শনিঠাকুরের মন্দিরের মতো ক'দিন আগে এই নেতাজি সংঘের প্রতিষ্ঠা। যে জায়গাটায় এই ক্লাবটা গজিয়ে উঠেছে, আগে সে জায়গাটা ফাঁকা ছিল। জায়গাটা ছিল বাংলাদেশ থেকে আসা এক পরিবারের। ব্যবসায়ী পরিবার। গোবরডাঙার প্রসন্নময়ী বাজারে ওদের মাছের আড়ত ছিল। মাছ আমদানি, রপ্তানি করার নামে নাকি ওরা গভীরভাবে চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। চাঁদু ঘোষালের সঙ্গে টক্কর লাগার পর তার হুমকির জেরে ঘর-বাড়ি ছেড়ে বাংলাদেশ চলে যায়। চাঁদু ঘোষাল নাকি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তোলা চেয়েছিল। ওই পরিবারের একটা বাচ্চা ছেলেকেও নাকি চাঁদু ঘোষালের ছেলেরা অপহরণ করেছিল। ছেলেকে ফিরে পাবার জন্য মোটা টাকার খেসারত দিতে হয়েছিল ওই পরিবারকে।

তাদের ফেলে যাওয়া জায়গাটাই বেছে নিয়েছিল চাঁদু ঘোষালের ছেলেরা। অল্পবয়সি কতগুলো ছেলে একদিনের মধ্যেই দখল-করা বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে বানিয়েছিল নেতাজি সংঘ। চিকনা, বিল্লু, রাখুরা এখন ওই ক্লাবেরই সদস্য। আড়ালে লোকেরা বলে সমাজবিরোধীদের ক্লাব। দিনে চলে তাস, জুয়া, রাতে মদের আসর। স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলে প্রায় ঢোকার মুখেই নতুন গজিয়ে ওঠা এই ক্লাব নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের ক্ষোভের সীমা নেই। তবু তারা কেউ কিছু বলতে পারে না। কারণ এই ক্লাবের ছেলেরাই চাঁদু ঘোষালের ফাই-ফরমাশ খাটে। এই ছেলেরাই একদিন মৌপিয়ার পিছনে লাগতে এসেছিল। সেই কথা প্রত্যুষ তুলে দিয়েছিল গোবরডাঙা বিধান স্মৃতি সংঘ ক্লাবের ছেলেদের কানে।

প্রত্যুষ এখন গোবরডাঙা বিধান স্মৃতি সংঘের বিশেষ কাছের লোক। ওরা প্রত্যুষকে অ্যাথলেটিক্স বিভাগের কোচ হিসেবে নিযুক্ত করেছে। মাঝে-মাঝে বাচ্চাদের ফুটবল কোচিংও করায়। গোবরডাঙা বিধান স্মৃতি সংঘের সভাপতি প্রবাল বিশ্বাস একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, স্থানীয় বিধায়কের আত্মীয়। চাঁদু ঘোষালকে তিনিই বলে দিয়েছিলেন, তার দলের ছেলেরা যেন বেশি বাড়াবাড়ি না করে। সেই থেকে চিকনা, বিল্লু, রাখুরা ফুঁসছে। একদিন না একদিন সুযোগ মতো সাইজ় করবে প্রত্যুষকে। প্রত্যুষের পরিচয় তারা ইতিমধ্যে পেয়েছে। ক্ষারটা তাদের মনে রয়েই গিয়েছে।

আজ সেই সুযোগ পেয়েছে ওরা। প্রত্যুষ নেতাজি সংঘ অতিক্রম করতেই চিকনা, বিল্লু, রাখুরা ঘিরে ধরল। সঙ্গে বখাটে মার্কা আরও কয়েকজন ছেলে। সব কটার রুক্ষ চুল, চোয়াড়ে চেহারা, চোখের চাহনি বাঁকা। চিকনা একটা বিল মেলে ধরল প্রত্যুষের চোখের সামনে। প্রত্যুষ তির্যক দৃষ্টিতে এক পলক তাকিয়ে দেখল চাঁদা বাবদ টাকা লেখার শূন্যস্থানে লেখা ১০০০ টাকার অঙ্ক।

প্রত্যুষ না দেখার ভান করে বলল, "কিসের বিল?"

চিকনা কান খুঁচিয়ে বলল, "আমরা এবার দুগ্গাপুজো করছি। বিলটা নিন।"

প্রত্যুষ বলল, "আমি এভাবে বিল নেব না। প্রধানশিক্ষকের নির্দেশ আছে আমাদের কোনও পুজোর বিল না নিতে। আমরা স্কুলের শিক্ষকরা একসঙ্গে মিলে যা কিছু চাঁদা দেওয়ার দেব," বলেই প্রত্যুষ ভ্রুক্ষেপহীন পদক্ষেপে এগিয়ে গেল।

টিফিনের পরে দোতলায় একাদশ শ্রেণির ক্লাস নিতে যাওয়ার সময় প্রত্যুষ লক্ষ্য করল স্কুল গেটের সামনে ললিতবাবু চিকনাদের সঙ্গে কথা বলছেন খুব নিচুস্বরে।

আজ স্কুলে মৌপিয়া আসেনি শরীর খারাপের জন্য। এলে টিফিনে ওর সঙ্গে কথা বলে প্রত্যুষ একটু হালকা হতে পারত। প্রত্যুষ ললিতবাবুকে ওদের সঙ্গে কথা বলতে দেখে কেমন যেন ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেল। তবে কি এটা তার কোনও গোপন চাল? মনে-মনে কঠোর হল প্রত্যুষ। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

AMARBOI.COM

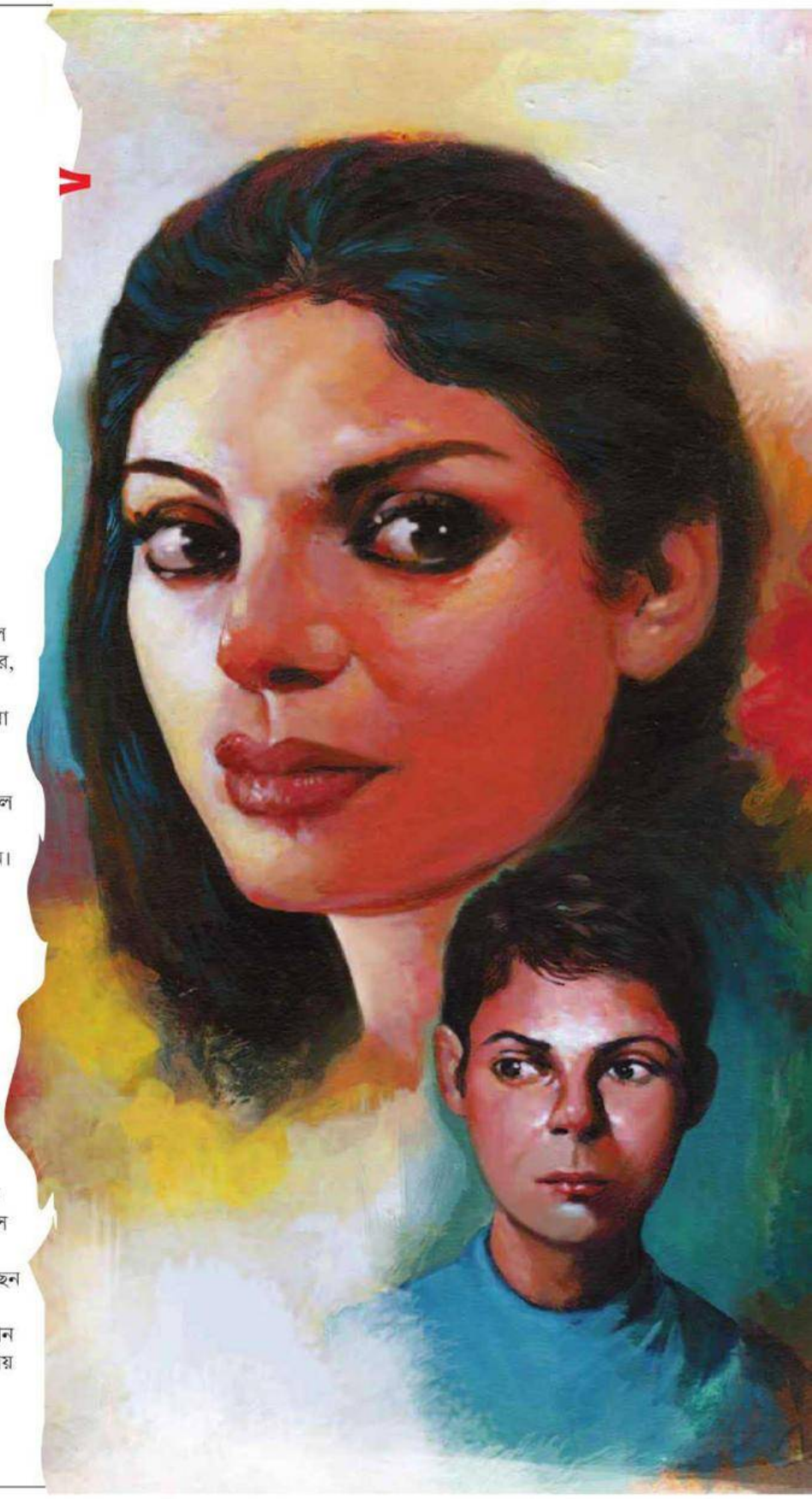

ছুটির পর ফেরার পথে আবার ওদের মুখোমুখি হল প্রত্যুষ। এবার অবশ্য প্রত্যুষের সঙ্গে অলোকস্যার, সাগরস্যার, কৌশিকস্যার।

বিল্লু হঠাৎ প্রত্যুষের কলার খামচে ধরে বলল, "আমরা চ্যাঙা-ব্যাঙা, তাই না? শালা খুব রোয়াব! আমাদের ক্লাবের জন্মের ঠিকানা নেই!"

প্রত্যুষ প্রথমে খুব চমকে গেল। ওরা কেমন করে জানল তার বলা কথা? এ কথাটা তো প্রত্যুষ স্টাফরুমে বলেছিল। অবশ্য ললিতবাবুও তখন স্টাফরুমে ছিলেন। প্রত্যুষ শুধু বলেছিল, "কী আস্পর্ধা কতগুলো চ্যাঙা-ব্যাঙার! যে ক্লাবের জন্মের ঠিকানা নেই, তারা বিল হাঁকিয়ে বলে এক হাজার টাকা দিতে হবে!"

বিল্লুর কথা শুনে অলোকস্যার, সাগরস্যার আর কৌশিকস্যারও চমকে গেলেন।

প্রত্যুষ বিল্লুর হাতটা ছাড়িয়ে বলল, "পথ ছাড়ো।"

বিল্লু বলল, "না ছাড়লে কী করবি?"

রাখু বলল, "খুব রংবাজি শিখেছিস, তাই না? বিল নিবি না! শালা এমন ভাবে কাদায় পুঁতে দেব, ওখান থেকেই যমদূতে তোকে টেনে নেবে।"

চিকনা বলল, "শালা স্কুলটাকে বৃন্দাবন বানিয়ে দিল। দিদিমণির সঙ্গে টিফিন শেয়ার! এমন ক্যালান ক্যালাব না, শালা ভূত হয়েও এখানে আসার কোনওদিন সাহস পাবি না।"

প্রত্যুষ অলোকস্যারদের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখছেন তো, একটা গাধা যদি জানে, যে সে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে তাকে বাঘ বলে সম্মান জানাবে, তবে সে ওই জায়গাটা কোনওদিন ছাড়তে চায় না। এদের অবস্থা হচ্ছে ঠিক তাই। এসব হজমি গুলি খেতে কামড় লাগে না, গিলেই খাওয়া যায়," প্রত্যুষ আস্তিন গোটায়।

আচমকা বিল্লু ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রত্যুষের ওপর। দেখাদেখি চিকনা, রাখু এবং অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গরা।
এক সময় ক্যারাটে শেখা প্রত্যুষ যথাসাধ্য প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল। অলোকস্যাররাও প্রত্যুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন।
শেষপর্যন্ত পিছন থেকে একটা ছেলে সজোরে একটা বাঁশের টুকরো দিয়ে প্রত্যুষের মাথায় মারলে প্রত্যুষ চেতনা হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। বিল্লুরা পালিয়ে যেতে অলোকস্যাররা প্রত্যুষকে নিয়ে আবার স্কুলে ফিরে গেলেন।
প্রত্যুষের তখন মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রত্যুষের জ্ঞান ফিরল। প্রত্যুষের মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধার পর শিক্ষকরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আলোচনায় বসল। যেসব ছাত্ররা তখনও স্কুলে ছুটোছুটি করছিল, দ্রুত এসে তারা ঘিরে ধরল স্টাফরুম। বেশির ভাগ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। ওরা ফুঁসতে লাগল।
আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল থানায় গিয়ে এফআইআর করা হবে।
ললিতবাবু বললেন, "এফআইআর করাটা ঠিক হবে না। ঘটনাটা হয়েছে পথে। পথের সমস্যা পথেই মেটানো উচিত। থানা, কোর্ট হলে স্কুলের সুনামহানি হবে। মিডিয়াকেও নানা কৈফিয়ত দিতে হবে। তা ছাড়া যে ছেলেগুলো মেরেছে, তারা আমাদের স্কুলের ছেলে ছিল। ওরা হাজতে গেলে মুখ পুড়বে আমাদেরই।"
ত্রিপুরেশ্বরস্যার হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "আপনি থামুন তো! কার হয়ে ওকালতি করতে চাইছেন? পায়ে গ্যাংগ্রিন হলে হাতের কী দোষ? আমাদের স্কুলের কেন বদনাম হতে যাবে? অপরাধীর একটাই মাত্র পরিচয়, যে সে অপরাধী।"
শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের প্রবল চাপে থানায় এফআইআর করা হল।
থানায় তো প্রথমে এফআইআর নিতেই রাজি ছিল না। প্রত্যুষ শুধু বলেছিল, "আমার বাবা বর্তমানে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আছেন। স্পেশ্যাল সেক্রেটারি," তাতেই কাজ হয়েছিল।
ঘটনার জল অনেক দূর গড়িয়েছিল। স্কুলের ছেলেরা পরের দিন নেতাজি সংঘ গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। প্রিন্ট এবং টেলিমিডিয়ার লোকজন হামলে পড়েছিল প্রত্যুষের উপর। প্রত্যুষের বাবার সূত্রে থানায় মন্ত্রীদের কড়কানি, ধর-পাকড়। প্রত্যুষের মা-র কাতর অনুরোধ, "খোকা, অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে নিজের বিপদ বাড়াস না। চলে আয়। কী হবে গুন্ডা-বদমাশদের ডেরায় পড়ে-পড়ে মার খেয়ে? অবুঝ হোস না খোকা।"
কিন্তু প্রত্যুষ যে আজ আর ছোট্ট খোকা নয়। ও যে নিজেই নিজের ঘাড়ে গুরুদায়িত্ব নিয়েছে।
প্রত্যুষ মার কাছে কিছু গোপন রাখেনি। তাই ওর মার সঙ্গে এখন মৌপিয়ার ফোনে কথা হয়। শেষপর্যন্ত প্রত্যুষের মা লক্ষ্মীপুরে এসে মৌপিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, "তুমিই পারবে মা প্রত্যুষকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে। আমি ঠিক সময় তোমাকে বরণ করে ঘরে তুলব।"
মৌপিয়া বলব-বলব করেও প্রত্যুষকে তার মার কথা বলেনি। মহাষ্টমীর রাতে প্যান্ডেলে-প্যান্ডেলে প্রত্যুষকে নিয়ে ঘোরার সময় হঠাৎ মৌপিয়া কথাটা পাড়ল। বলল, "এই জানো, হঠাৎ তোমার মার কথাটা আমার ভীষণ মনে পড়ছে। আমারও ইচ্ছে তুমি আর এখানে থেকো না। মার কথা অমান্য করলে অমঙ্গল হয়। তুমি বরং ডেলি প্যাসেঞ্জারি করো। চাঁদু ঘোষাল এখানে তোমাকে থাকতে দেবে না।"
"তুমিও একথা বলছ! আচ্ছা দাদুকে আজ বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসা কোরো তো, ব্রিটিশ পুলিশের ভয়ে দাদু কি এ জায়গা ত্যাগ করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন? কোথায় ব্রিটিশ পুলিশ আর কোথায় চাঁদু ঘোষাল! আর মার কথা ভেবো না। মা-র দুশ্চিন্তা অকারণ। হাজার-হাজার ভারতীয় জওয়ানের কি বাবা-মা নেই? তা ছাড়া আমার স্বপ্ন কিন্তু এখনও পূরণ হয়নি। এখনও এখানকার প্রচুর স্কুলছুটদের স্কুলমুখী করে তোলা বাকি।"

॥ ২১ ॥

একেই বলে কঠোর পরিশ্রম আর একাগ্র সাধনার ফল। লক্ষ্মীপুরে আসা ইস্তক এই প্রথম প্রত্যুষের একটা স্বপ্ন সফল হল। প্রল্লিম, সুদীপ, মন্টু, নন্তুদের নিয়ে তার মাঠের নিরলস প্রচেষ্টা ও সাধনার ফল ব্যর্থ হয়নি। তার নিষ্ঠা এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য যে তারই অনুগত ছাত্রদের রক্তে সে চারিয়ে দিতে পেরেছিল, সে কথা ভেবে তার মন আজ খুশিতে উজ্জ্বল। আন্তঃস্কুল অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় প্রল্লিম আর মন্টু যে শুধু তার মুখ রেখেছে তাই নয়, সারা রাজ্যে তাদের স্কুলের সুনাম তুলে ধরেছে। আজ প্রল্লিম আর মন্টুর পারদর্শিতায় স্কুলের মানমর্যাদা এক লাফে বহুগুণ বেড়ে গেছে। প্রল্লিম ও মন্টু তাদের নিজস্ব বিভাগে ১০০ এবং ২০০ মিটার ফ্ল্যাট রেসে প্রথম হয়েছে। স্কুলের পক্ষ থেকে ওদের দু'জনকে বিশেষ সংবর্ধনাও দেওয়া হয়েছে। ছাত্রমহলে ওরা এখন হিরোর মর্যাদা পাচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রিন্টমিডিয়া এবং টেলিমিডিয়ার সাংবাদিকরা এসে ওদের এবং প্রত্যুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, গোটা স্কুল এবং শিক্ষকমণ্ডলীর ফোটোও তুলে নিয়ে গিয়েছে রাজ্যের একটি বিখ্যাত ক্রীড়াপত্রিকার পক্ষ থেকে।
প্রধান শিক্ষক একান্তে প্রত্যুষকে ডেকে পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, "আপনার এই সাফল্য এবং আমাদের স্কুল নিয়ে যাবতীয় স্বপ্ন দীর্ঘজীবী হোক। ভবিষ্যতে যে-কোনও উদ্যোগে আপনার পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"
প্রথম প্রচেষ্টায় সাফল্য পেলেও স্কুলছুট ছাত্রদের নিয়ে ভাবনা তার মনটাকে কুরে-কুরে খাচ্ছিল।
ইতিমধ্যেই সনৎস্যারের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে সমস্ত স্কুলছুট ছাত্রদের এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেছে প্রত্যুষ। স্কুলছুট ছাত্ররা তো রাজি, তাদের অভিভাবকরাও রাজি। শুধু শর্তটা হল স্কুলছুট ছাত্ররা যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করত, সেই পরিমাণ অর্থ অভিভাবকদের হাতে তুলে দিতে হবে।
স্কুলের কমিটি মিটিংয়ে সেই কথাটাই পাড়ল প্রত্যুষ। উপরন্তু প্রস্তাব দিল, যাতে তালিকাভুক্ত বাহান্নজন স্কুলছুট ছাত্রকে ছাত্রাবাসে রেখে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
সেক্রেটারি দুলালবাবু বললেন, "সেটা কী করে হয়? ছাত্রাবাসে নতুন ছাত্র ভর্তি অসম্ভব। একেবারে সিট নেই।"
প্রধানশিক্ষক মাখনবাবু বললেন, "এর জন্য হস্টেলের ঘর বাড়াতে হবে। অবশ্য তার আগে সরকারের কাছে গ্রান্টের জন্য আবেদন পাঠাতে হবে। সাংসদ বা বিধায়ক তহবিল থেকে আর টাকা পাওয়া যাবে না।"

স্কুলের ছেলেরা পরের দিন নেতাজি সংঘ গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। প্রিন্ট এবং টেলিমিডিয়ার লোকজন হামলে পড়েছিল প্রত্যুষের উপর। প্রত্যুষের বাবার সূত্রে থানায় মন্ত্রীদের কড়কানি, ধর-পাকড়।

প্রত্যুষ বলল, "কিন্তু তা হলে তো টাকা পেতে পেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আবার ওদের ছাত্রাবাসে না রেখে পড়ালে বাবা-মা বা পরিস্থিতির চাপে স্কুলছুট হতে পারে।"

ললিতস্যার ওত পেতে ছিলেন এতক্ষণ। বললেন, "স্কুলের টাকা তো আর গাছের পাকা টোপা কুল নয়, যে নাড়া দিলেই ঝুরঝুর করে পড়বে।" ইংরেজি শিক্ষক প্রিয়ম হালদার বললেন, "সবই না হয় মানা গেল। কিন্তু স্কুলছুট ছাত্রদের অভিভাবকদের হাতে কীভাবে মাসে-মাসে ক্ষতিপূরণের টাকা তুলে দেওয়া যাবে?"

ললিতস্যার বললেন, "আমিও তাই বলব ভাবছিলাম। স্কুলে বসে স্কুলছুট ছাত্ররা তো আগের মতো ইটখোলা, টালিখোলার কাজ করতে পারবে না। গ্যারাজের কাজ গ্যারাজে হয়, মাঠের কাজ মাঠেই হয়।"

প্রত্যুষ বলল, "আমার এক বন্ধুর বাবা ইনস্টিটিউট অফ টয় মেকিং টেকনোলজি-র বড় অফিসার। তাকে বললে ট্রেনিং, খেলনা তৈরির সরঞ্জাম এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। স্কুলছুট ছাত্ররা অবসর সময় খেলনা তৈরি করে তাদের বাবা-মাকে আর্থিক সাহায্য করতে পারবে।"

ললিতবাবু শেষ আঁচড় দিতে ছাড়লেন না। বললেন, "স্বপ্নের ডানা গজাতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু উড়তে না উড়তেই দম বেরিয়ে যায়। এই প্রকল্পটার কথা শুনতে তো মন্দ লাগছে না, কিন্তু খেলনা তৈরির সরঞ্জাম ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র কেনার টাকা দেবে কে? এ যুগের গৌরী সেনরা তো শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত।"

কমিটি মিটিং থেকে একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরে গিয়ে প্রত্যুষ নিজের ঘরে ঢুকতেই মহীতোষবাবু তার হাতে একটা রেজিস্ট্রি খাম তুলে দিলেন। খাম খুলে চিঠি পড়তে-পড়তে প্রত্যুষ বলে উঠল, "ইউরেকা!"

মহীতোষবাবু বললেন, "চিঠির মধ্যে আবার কী পেলে?"

"আলিবাবার রত্নগুহা পেয়ে গিয়েছি। আর আমাকে স্কুলছুট ছাত্রদের কথা ভাবতে হবে না।"

মহীতোষবাবুকে পুরো কথাটা খুলে বলল প্রত্যুষ। হতভাগ্য শিশু-কিশোরদের দৈন্যদশা বিষয়ক একটা আন্তর্জাতিক ফোটো প্রতিযোগিতায় প্রত্যুষের ফোটোগ্রাফ বিজয়ী হয়েছে। পুরস্কারের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা।

মহীতোষবাবু বললেন, "কার ফোটো? ক্যাপশনই বা কী দিয়েছিলে?"

"নিতাইয়ের ফটো। চিতার প্রচণ্ড তাপ সহ্য করে মুখ বিকৃত করে মড়া পোড়াচ্ছে। ক্যাপশন ছিল, 'অ্যালাস রিয়ালিটি! ফায়ার অ্যান্ড নো ফিয়ার, জাস্ট ফর পভারটি।' "

এমন মায়াবী প্রকৃতির সান্নিধ্য ছেড়ে কারই বা যেতে ইচ্ছে করে? তবু যেতে হবে। ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় প্রথম হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এর জন্য তাকে কম মেহনত করতে হয়নি।

॥ ২২ ॥

আঘাতটা যে এভাবেই আসবে, প্রত্যুষ তা কল্পনাও করতে পারেনি। ঠিক কারা ওকে রাতের অন্ধকারে মেরেছে, সে কথা চিন্তা করে এখনও কূলকিনারা পায়নি। শিশুশ্রমিক উদ্ধার করার ব্যাপারে শেষবারের মতো মাত্র দু'জায়গা থেকে সে প্রাথমিকভাবে বাধা পেয়েছিল। কামারপাড়ার ভাঙা শিশিবোতল কারখানা থেকে আর গয়েশপুরের বাজি কারখানা থেকে। দুটো কারখানার কাজই শিশুশ্রমিকদের কাছে বিপজ্জনক ছিল। একসময় এই দুটো কারখানার মালিকের সঙ্গে শিশুশ্রমিকদের খাটানো নিয়ে তার তর্কাতর্কি হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা পেরে ওঠেনি। সব শিশু শ্রমিকই প্রত্যুষের ডাকে সাড়া দিয়েছিল।

প্রত্যুষ নার্সিংহোমে ভর্তি হওয়ার পর অবশ্য এগারো-বারো ক্লাসের ছাত্ররা ওই দুটো কারখানা তছনছ করে দিয়েছিল। টিভি-তে খবর দেখে প্রত্যুষের বাবা-মা দু'জনেই উদ্বিগ্নচিত্তে ছুটে এসেছিলেন।

প্রত্যুষের বাবা তো রেগে আগুন! পারলে সেদিনই প্রত্যুষকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। প্রধানশিক্ষক অনেক বলে-কয়ে তাঁকে নিরস্ত করেন। বলেন, "আমরা যথাসময়ে এফআইআর করেছি। দোষীরা ধরা পড়বেই।"

প্রত্যুষের বাবা তবুও দমেন নি। বলেছিলেন, "এখানে এই অজ পাড়াগাঁয়ে ভিলেজ পলিটিক্স, কী তা ঢের জানি। এরপরেও যে এমন ঘটনা হবে না, তার কি কোনও গ্যারান্টি আছে?"

প্রধানশিক্ষক জোড় হাতে বলেছিলেন, "আগে প্রত্যুষবাবু সুস্থ হয়ে উঠুন। তারপর না হয় যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেওয়া যাবে।"

॥ ২৩ ॥

চা খেতে-খেতে প্রত্যুষ মুগ্ধ চোখে ইতিউতি তাকাচ্ছিল। সকালের এসময়টা প্রত্যুষের ভীষণ ভাল লাগে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়া নতুন ভোরের আলো। দিগন্ত রাঙানো যেন এক অলৌকিক উদ্ভাস। কে যেন চরাচরব্যাপী সোনালি আবির ছড়িয়ে প্রাণের আনন্দে প্রকৃতির সঙ্গে হোলি খেলছে। প্রত্যুষের মনটা এসময় খুব হালকা লাগে। তার কাছে প্রত্যেকটা দিনের সূচনা যেন অন্যরকম। গাছপালা, প্রাকৃতিক শব্দ, পাখিদের কাকলি, রাতে ফোটা ফুলের মিষ্টি গন্ধ, নির্মল বাতাস, সব মিলিয়ে মনপ্রাণ ভরে যায়।

এই প্রকৃতির সান্নিধ্যের জন্যই তো লক্ষ্মীপুরে এসে নতুন করে উদ্বুদ্ধ হয়েছে সে। প্রকৃতি যেন এক নীরব সেবিকা। অগোচরে মানুষের অন্তরের রক্তাক্ত ক্ষতে প্রশান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। জীবনের যে কোনও স্তরের, যে কোনও বৃত্তির মানুষের কাছে প্রকৃতি তার অবারিত দাক্ষিণ্যের দ্বার খুলে বলে, 'এসো। পার তো আমার মধ্যে নিজেকে বিলীন করো। কিছু শেখো অথবা আমাকে উপলব্ধি করে অন্য কাউকে শেখাও।'

একথা সত্যি যে, যাবতীয় হিংসা, দ্বেষ, নীচতা, হীনতা, স্বার্থপরতা থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ বেঁচে থাকে মানুষের মনের কুঠুরিতে শুধু তার প্রাণশক্তি আর গুণাবলির মহিমায়। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হলেই মানুষ এই একান্ত অনুভবের কথা টের পায়। লক্ষ্মীপুর গ্রামটাকে প্রত্যুষ এত কাছে টেনে নিতে পেরেছে প্রকৃতিরই জন্য। এ বদান্যতা ভোলার নয়।

এমন মায়াবী প্রকৃতির সান্নিধ্য ছেড়ে কারই বা যেতে ইচ্ছে করে? তবু যেতে হবে। ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় প্রথম হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এর জন্য তাকে কম মেহনত করতে হয়নি।

সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পরও এই পরীক্ষায় পাশের জন্য বহু রাত জাগতে হয়েছে কঠোর পড়াশোনা করতে। আসলে ঠিক নিজের জন্য নয়, বাবার একান্ত ইচ্ছাকে রূপদান করার জন্য প্রত্যুষ এমন কঠিন প্রতিযোগিতায় নেমেছিল।

স্কুলের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হিমাংশুবাবুও তাকে বলেছিলেন, "স্কুলের স্বার্থে না গেলেই নয়? আপনাকেই তো মাচা করে স্কুলের অবাধ্য ছেলেগুলো ডিসিপ্লিন মেনে পোকায় কাটা লাউগাছের ডগার

মতো সংশোধনের নতুন ডালপালা ছড়িয়ে, আপনাকে আঁকড়েই বাঁচতে শিখেছিল।"
প্রত্যুষ হেসে বলেছিল, "আমি তো গোটা মাচাটাই উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি না। আমার পোঁতা খুঁটিগুলি ঠিকই শক্ত আছে। নতুন মাচা বানানোর মানুষও এসে গিয়েছে। প্রাণবন্ত গাছ ঠিক মাচা চিনে নেবে।"
প্রত্যুষের স্মৃতিমন্থনের মাঝে হাতে আলুর দমের বাটি আর প্লেটভরা লুচি নিয়ে তরুবালা এলেন। তারপর তার পাশে বসে বললেন, "তুমি কি সত্যি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ?"
প্রত্যুষ মাথা নিচু করে বলল, "হ্যাঁ কাকিমা।"
কথাটা বলতে গিয়ে প্রত্যুষের গলার কাছটা যেন দলা পাকিয়ে উঠল। তরুবালা যেন তার দ্বিতীয় মা। বিচ্ছেদের কথা কোন মা-কেই বা বুক বাজিয়ে বলা যায়?

॥ ২৪ ॥

মেদিয়ার বাঁওড়ের পাশে প্রত্যুষের প্রিয় জায়গাটায় আজ আবার সে এসেছে মৌপিয়াকে সঙ্গে নিয়ে। এই নিয়ে কতবার যে এখানে এল, তার গোনাগুনতি নেই। প্রত্যুষের জীবনে এ জায়গার স্মৃতি কোনওদিনই মুছবে না। মৌপিয়ার প্রথম আলিঙ্গনের সুখস্মৃতি যতদিন তার হৃদয়ের ক্যানভাসে ছবি হয়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত প্রত্যুষের কাছে এ জায়গার মূল্য অসীম। সারাজীবনই প্রত্যুষের কাছে এই জায়গাটা প্রিয়তম স্থান হয়ে থাকবে।
সঙ্গে আনা পুরনো খবরের কাগজ বিছিয়ে প্রত্যুষ আর মৌপিয়া ঠিক বাঁওড়ের কিনার ঘেঁষে বসল। জায়গাটা বরাবরই নির্জন। চারদিকে শুধু পাখিদের কলধ্বনি। যেন এক রোম্যান্টিক পরিবেশের আবহসঙ্গীত। অনেক দূরে বিন্দু আকৃতির কতগুলি নৌকা। মাঝবাঁওড়ে কিছু জেলে মাছ ধরছে।
আজও প্রত্যুষ বসে প্রথমে সাইড ব্যাগ থেকে মুড়ির ঠোঙা বের করল। তারপর মুঠো করে ছুঁড়তে লাগল বাঁওড়ের জলে। আর অমনই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল চরতে থাকা মাছেদের ঝাঁকের মধ্যে। কয়েকমুঠো মুড়ি দেওয়ার পর মৌপিয়াকে বলল, "কী গো, তুমি মুড়ি নিচ্ছ না যে? আজ মাছদের মুড়ি খাওয়াবে না?"
এখানে বসে মাছদের মুড়ি খাওয়ানোটা ওদের এক প্রিয় অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। এ ব্যাপারে মৌপিয়ার ইচ্ছে এবং উচ্ছ্বাসটাই বেশি ছিল। কিন্তু মৌপিয়া আজ কোল থেকে হাত তুলল না।
"কী গো! সেই থেকে চুপ করে আছ! নাহ্, আজ দেখছি সত্যি তোমার মুড অফ। আচ্ছা সত্যি করে বলো তো মৌপিয়া, তুমি কি আমার সাফল্যে খুশি হওনি?"
"সবাই তো সমানভাবে খুশি হতে পারে না, গর্বিত হতে পারে না।"
"এই দেখো! গর্বের কথা কখন আমি বললাম? দেখো ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছি বলে আমি গর্বিত, এ কথা কখনও আমি ঘুণাক্ষরেও বলতে চাই না। সে দাম্ভিকতা আমার নেই। তুমি তো আমাকে ভালই চেনো। ফার্স্ট হওয়ার আনন্দটা আমার কাছে অন্য এক বিশেষ কারণে ইতিবাচক।"
"সেই কারণটা কি জানতে পারি?"
"অবশ্যই। আসলে এ পরীক্ষাটা তো একটা কঠিন পরীক্ষা। হাড্ডাহাড্ডি কম্পিটিশন। ঘোরতর এক সংগ্রাম। সে সংগ্রামে আমি পিছিয়ে পড়িনি। বরং সবার আগে থেকে জয়ী হয়েছি। জানো তো, রিলে রেসে সবার আগে যে ব্যাটনটা নিয়ে দৌড়য়, সে কিন্তু শুধু নিজের সাফল্যের জন্য দৌড়য় না। অনুসরণকারী সঙ্গীদেরও সবার আগে এগিয়ে দেয়। আমার সাফল্য ঠিক এই ধর্মেরই দিশারি। আমার এই সাফল্য যদি কখনও কোনও ছাত্রছাত্রীকে এভাবেই উদ্বুদ্ধ করতে পারে, উদ্দেশ্যমুখী করে তুলতে পারে তা হলে সেই সাফল্যে সবচেয়ে বেশি খুশি হব আমি।"
মৌপিয়া বাঁওড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "রিলে রেসের দৌড়বীররা তো একই সঙ্গে জেতে, একই সঙ্গে ভিকট্রি স্ট্যান্ডে ওঠে। কেউ কি সঙ্গীর অপেক্ষায় না থেকে আগেই রেসের মাঠ ছেড়ে চলে যায়?"
"ও তাই বলো! আমি তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না, মহারানির কীসে এত গোঁসা! এবার বুঝেছি। কিন্তু আমি তো চিরকালের জন্য লক্ষ্মীপুর ছাড়ব বলিনি। হাতলাটুর সুতোটা তো তোমার আঙুলেই বাঁধা।"
ভারী হয়ে থাকা মৌপিয়ার মনের বাতাসকে এবার আরও লঘু করার উদ্দেশ্যে প্রত্যুষ এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "কেন যে সেই হনুমানটা আসছে না!" বলেই পরক্ষণে বলল, "ও সরি, হনুমান তো এখন আমি নিজেই। খালি হাতে ফিরে যাবার পাত্র নই। গোটা গন্ধমাদনটাই নিয়ে যাব এখান থেকে।"
"মানে?" মৌপিয়া সহজ হওয়ার চেষ্টা করল।
"গন্ধমাদন মানে গোটা লক্ষ্মীপুর। এখানকার কোনও স্মৃতিই আমি ফেলে যেতে পারব না।"
"ওটা কথার কথা। আসলে তো তুমি আমাকে ফেলেই যাচ্ছ।"
"না গো, বরযাত্রী নিয়ে আসার আগে আরও কতবার যে আসতে হবে।"
"কিন্তু তোমার এত প্রিয় স্কুল যে তোমাকে হারাবে?"

"কেন? তুমি তো আছ। তোমার মধ্যেই তো আমি আছি। আমি তো রিলে রেসের ব্যাটনটা তোমার হাতেই তুলে দিয়েছি।"
হঠাৎ মৌপিয়া ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর দ্রুত প্রত্যুষের কণ্ঠলগ্না হয়ে বলল, "এই বাঁওড় জুড়ে, স্কুল-কলকাকলি জুড়ে, আমাদের বাড়ি, মহীতোষকাকুদের বাড়ি, গোটা লক্ষ্মীপুরের বুকে তোমার লাগানো গাছগুলো জুড়ে শুধু তোমার স্মৃতি। আমি যে বড় একা হয়ে গেলাম।"
প্রত্যুষ এবার দু'বাহুর বন্ধনে মৌপিয়াকে জড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ আবিষ্ট হয়ে থাকার পর বলল, "দূর বোকা মেয়ে! দুটো বুভুক্ষু মনের ওয়েভলেংথ যখন একাকার হয়ে একটাই প্রাণতরঙ্গের সৃষ্টি করে, তখন কি তাকে পৃথক করা যায়? সেই তরঙ্গ তো একটা প্রাণেরই মূর্ছনা।"
মৌপিয়ার ভালবাসার নিঃশব্দ অশ্রুধারা ততক্ষণে প্রত্যুষের জামা, গেঞ্জি চুঁইয়ে ভিজিয়ে দিল প্রত্যুষের রোমশ বুকের ছোট্ট দ্বীপটা।

॥ ২৫ ॥

আজ একই সঙ্গে আনন্দ আর বেদনার দিন। আজ ছাত্রাবাসের বাড়তি দুটো ঘরের এবং খেলনা তৈরির জন্য বিরাট হলঘরের উদ্বোধন হবে। সভাপতি সনৎস্যার। সনৎস্যারই আপাতত বাহান্নজন স্কুলছুট ছাত্রকে নিজের বাড়িতে স্থান দিয়েছেন। প্রধান অতিথি প্রত্যুষের বাবা। তিনি আজ প্রত্যুষকে নিয়েও যাবেন। আগেই ফোনে মাখনবাবুকে জানিয়েছিলেন যে, ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় প্রত্যুষ প্রথম হয়েছে। এ মাসেই পোস্টিং। এবার নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যুষকে স্কুল ছাড়তে বাধা দেবেন না, এটা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। প্রত্যুষের মা-ও আজ দর্শকাসনে উপস্থিত। অনুষ্ঠান শুরু হলে দেখা গেল প্রত্যুষের ম্লান মুখ। দর্শকাসনে প্রত্যুষের মা প্রত্যুষের গুণগান শুনে এবং উপস্থিত মানুষের ঢল দেখে বিস্মিত। শুধু স্কুল ছাত্ররা নয়, সমস্ত লক্ষ্মীপুর গ্রামের মানুষ যেন উপচে পড়েছে প্রত্যুষের বিদায়বেলার সাক্ষী হয়ে থাকতে।
এক সময় প্রধানশিক্ষক বলতে উঠলেন। ভাষণের শুরুতেই তার গলা ভারী হয়ে উঠল। তবু কোনওক্রমে বলে চললেন, "আজ আমরা এক অত্যন্ত প্রিয়জন ও কাছের মানুষকে হারাতে চলেছি, যিনি ছাত্রদের কাছে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আন্তঃস্কুল অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় আমাদের স্কুল যে পাঁচটি সোনার পদক পেয়েছিল, তার সিংহভাগ কৃতিত্ব প্রত্যুষবাবুর। বনসৃজনে তিনি এ অঞ্চল জুড়ে মহাবিপ্লব এনেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের স্কুলে স্কুলছুট ও গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য তিনি পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেছেন। এর তুলনা মেলা ভার। আজ তিনি আমাদের রাজ্যের একটি দায়িত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদের গুরুভার নিতে চলেছেন। তাঁকে আমাদের পক্ষ থেকে আজ হাসিমুখেই বিদায় দেওয়া উচিত।"
সবার শেষে প্রত্যুষ কিছু বলতে উঠলে এক অব্যক্ত আবেগে তার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে উঠল। অনেক কষ্টে বলল, "লক্ষ্মীপুরের মাটি ছেড়ে, আমার সমস্ত প্রিয় ছাত্র, সহকর্মী এবং গ্রামবাসীদের ছেড়ে যেতে এ মুহূর্তে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তবু আমাকে যেতে হবে জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে। আমি এর জন্য সবার কাছে মার্জনা চাইছি। সেই সঙ্গে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি অরণ্য সপ্তাহের সাতদিনের মধ্যে একদিন ঠিক আমি এ গ্রামে এসে গাছ লাগিয়ে যাব। সেই গাছের সঙ্গে বেঁচে থাকবে আমার স্মৃতি।"
প্রত্যুষের কথা বলা শেষ হয়ে গেলে দ্বাদশ শ্রেণির সেরা ছাত্র অর্ক দর্শকাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, "স্যার, আপনি আমাদের কাছে ছিলেন পরমশ্রদ্ধেয় এক স্বপ্নের জাদুকর। এতদিন স্বপ্নের নানা জাদু দেখিয়ে আপনি আমাদের পরীক্ষা নিতেন। আজ আমরা আপনার একটামাত্র পরীক্ষা নেব। আজ আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। আমরা বিন্দুমাত্র বাধা দেব না। হৃদয় দিয়ে আমরা আপনাকে কিছুতেই আটকাতে পারলাম না। এখন সম্বল শুধু আমাদের এই শরীর। তাই আমরা আমাদের শরীর দিয়েই আপনার চলে যাওয়ার রাজপথ সৃষ্টি করতে চাই। আপনার শেষ বিদায়ের পায়ের ধুলো সারা গায়ে মেখে শেষবারের মতো ধন্য হতে চাই।"
অর্কর ইঙ্গিতে পরক্ষণে সব ছাত্রছাত্রীরা হত্যে দেওয়ার মতো সটান মাটিতে শুয়ে পড়ল। গোটা পরিকল্পনাটা ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া কেউ জানত না। স্তম্ভিত প্রত্যুষ কী করবে ভেবে পেল না। এতগুলো শিশু, কিশোর, কিশোরীদের দেহ মাড়িয়ে দেবতারাই যেতে পারবে না, সে তো কোন ছার! প্রত্যুষ টের পেল ক্রমশ তার দু'চোখের উপকূল অশ্রুর নোনাজলে ভিজে জবজবে হয়ে যাচ্ছে। দু'চোখ খরস্রোতা নদী হয়ে ওঠার আগেই প্রত্যুষ বলল, "এতগুলো নির্ভেজাল, অকৃত্রিম হৃদয়ের কাছে আজ আমি হেরে গেলাম। আমি আছি। তোমাদের কাছে যেমন ছিলাম, তেমনই থাকব। তুলে রাখা দুর্লভ মোহর নয়, আগের মতোই ব্যবহারযোগ্য মুদ্রা হয়ে থাকব। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারো। আমি স্কুল ছেড়ে যাচ্ছি না। আজ থেকে এই স্কুলই আমার কাছে মহাতীর্থ।"
প্রত্যুষের বলার পরই প্রধান অতিথির আসন ছেড়ে প্রত্যুষের বাবা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "প্রত্যুষের ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা যে প্রত্যুষকে এতটা শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে তা এভাবে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। প্রত্যুষ উজাড়-করা শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে যথার্থ সম্মান জানিয়ে উচিত কাজই করেছে। ওরা সত্যিই সবার সম্মান পাওয়ার যোগ্য। ওরাই স্কুলের আদর্শ ছাত্রছাত্রী।"
ছাত্রছাত্রীরা এরপর উঠে দাঁড়িয়ে হাততালিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল। দর্শকাসন থেকে মহীতোষবাবু উঠে এসে ফিক করে হেসে প্রত্যুষের কানে- কানে বললেন, "একদিন বলেছিলাম না, কোনও মানুষ যদি অন্য কোনও মানুষের হৃদয়ের গভীরে একবার শিকড় গেড়ে বসে, তখন সে মহীরুহ হয়ে যায়। মাটি যেমন পারে না মহীরুহকে ছেড়ে থাকতে, তেমনই মহীরুহও পারে না সে মাটি থেকে নিজের সুবিস্তৃত শিকড় উপড়ে ফেলতে।"
দূরে, স্কুলের পলাশ গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে অশ্রুসিক্ত মৌপিয়া সবার অগোচরে চোখের জল মুছছিল। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল প্রত্যুষ এভাবে যেতে পারে না। যার নিজের নামই প্রত্যুষ, সে কখনও অস্তাচল ভালবাসতে পারে না। ওর রোদ্দুরে আবার ভেসে যাবে গোটা তল্লাট, স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুল... এমনকী মৌপিয়া নিজেও।

ছবি : প্রসেনজিৎ নাথ